সাহিত্য-কথা

(প্রথম ভাগ)

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

এক টাকা চারি আনা

দীপালী গ্রন্থশালা

ফাল্গুন, ১৩৪৮

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক, ১২৩।১ আপার সার্কুলার
রোডস্থ দীপালী প্রেসে মুদ্রিত
এবং দীপালী গ্রন্থশালা
হইতে প্রকাশিত।

ভূমিকা

পনের-ষোল বৎসর বয়স হইতে যাযাবর জীবন অবলম্বন করিয়া, প্রায় চল্লিশে আসিয়া কলিকাতায় স্থায়ীভাবে বসিয়াছি। জীবনের এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠকাল বাঙ্গলার বাহিরে এবং অবাঙ্গালীর মধ্যে বসবাস করিয়াও, বাঙ্গলা ভাষার সেবা করিতে কখনও অবহেলা করি নাই। সময় ও সুযোগ ঘটিলেই কলিকাতায় ছুটিয়া আসিয়া, বাঙ্গলার ও বাঙ্গালীর মুখ দেখিয়া, বাঙ্গলায় কথা কহিয়া, বাঙ্গলা কথা শুনিয়া এবং বাঙ্গলার বিশিষ্ট খাদ্য পানীয় গ্রহণ করিয়া, অনির্ব্বচনীয় আনন্দলাভ করিতাম।

এই দীর্ঘকালের মধ্যে যখন যে বিষয়ে কিছু চিন্তা করিয়াছি, তখনই সাময়িক পত্রাদিতে তাহা ছাপা হইয়াছে। কবে কোন্ রচনা কোথায় যে প্রকাশিত হইয়াছে, আজ তাহা মনেও নাই এবং তাহাদের সন্ধান করাও এক রকম অসম্ভব। এখানে আসিয়া অবধিই লুপ্ত রচনাগুলির সন্ধানে প্রবৃত্ত আছি। উদ্ধার যেগুলি করিয়াছি, সেইগুলিকে শ্রেণীবিভক্ত করিয়া গ্রন্থাকারে একত্র করিবার দুশ্চেষ্টার প্রথম ফল এই, **সাহিত্য-কথা**।

"সাহিত্য-কথা"র রচনাগুলির প্রকাশ-তারিখ প্রত্যেক প্রবন্ধের নীচেই মুদ্রিত আছে, সুতরাং চিন্তাধারার পারম্পর্য্য লক্ষ্য করিতে পাঠক-পাঠিকাদের তেমন কোনও অসুবিধা হইবে না বলিয়াই, মনে করি।

এই প্রসঙ্গে আমার একটি কৈফিয়ৎ দিবার আছে। এই পুস্তকের

প্রথম প্রবন্ধটিই বোধ হয় আমার সাহিত্য-বিষয়ক প্রথম গদ্য-রচনা। ইহাতে যে অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে, পরবর্ত্তী অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতেই তাহার আমূল প্রতিবাদ করিয়াছি। এই পরিবর্ত্তনটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রবন্ধের রচনাকালে মাত্র আট বৎসরের ব্যবধান। আমি আমার চিন্তার ইতিহাস ও ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিতে, প্রবন্ধ দুইটি যথাযথই পুনর্ম্মুদ্রিত করিলাম। ইতি সন ১৩৪৮ সাল, ১৮ই ফাল্গুন, দোলপূর্ণিমা

কলিকাতা, শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

১৯৪২।২রা মার্চ্চ

সাহিত্যরসিক স্নেহশীল

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু

সুহৃদ্বরেষু

সূচী

সাহিত্য-কল্প

১

বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্য

বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের বিষয় আলোচনা করিবার পূর্ব্বে, একবার অতীতের দিকে একটু দৃষ্টি না দিলে, সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে না। বুঝিতে হইবে, কোন্ শক্তির প্রভাবে ও কোন্ মন্ত্রগুণে সেই বিস্মৃত অতীতের গভীর অন্ধকাররাশি ভেদ করিয়া, পুরাতন কবিগণের গীতিসমুচ্ছ্বাস আজিও অবিরত আমাদের কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিতেছে, যে-গীতি শ্রেণীবিশেষের মধ্যে আবদ্ধ নহে : বুঝিতে হইবে, কেন বর্ত্তমান যুগের রূপকসমাসালঙ্কারসমলঙ্কৃতা ও নবভাবে অনুপ্রাণিতা শুদ্ধ সংস্কৃত বাগ্নিবদ্ধা "কোমল মধুর কান্ত" ভাবপটীয়সী কাব্যকবিতা অথবা অঘটনসংঘটনপটীয়সী কুহকজাল-সমাকীর্ণ লোমহর্ষবিধায়িনী নাটকউপন্যাসাবলী ঐরূপ মর্ম্মতল পর্য্যন্ত প্রবেশ করে না। তাহার উত্তর এক কথায় : বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্য শব্দ-ভাব-রূপক-অলঙ্কারগৌরবে যতই গৌরবান্বিত হউক না কেন, তাহার মূলভিত্তি নাই : এবং যদিও কোথাও থাকে, তবে তাহা বাঁচিয়া থাকিবার পক্ষে নিতান্তই সামান্য। কলিকাতার চৌতল পঞ্চতল মহতী অট্টালিকা-শ্রেণীর মত ইহাদের বহিঃসৌন্দর্য্য মনোমুগ্ধকর, কিন্তু ভিত্তি অতি স্বল্প—তাহাদের আমূল পতন সামান্য ভূকম্পনেই অনিবার্য্য। আমাদের সাহিত্যের অবস্থাও ঠিক সেইরূপ হইয়াছে! কাজেই এ সাহিত্য যে স্থায়ী হইবে, অথবা এই সাহিত্য বঙ্গভাষায় স্থায়ী সম্পৎরূপে যে পরিগণিত হইবে, এ আশা অন্ততঃ বর্ত্তমান সময়ে দুরাশা।

জাতির ধর্ম্মই জাতীয় সাহিত্যের মেরুদণ্ড। জাতীয় ধর্ম্ম নীতি সভ্যতা কৃষ্টি ও বিশ্বাসের সাক্ষী সাহিত্য। জাতির ধর্ম্ম, বিশ্বাস, নীতি, সভ্যতা ও অনুশাসনই সাহিত্যের প্রাণধর্ম্ম। এই ধর্ম্মবিবর্জ্জিত হইলেই সাহিত্য নগণ্য হইয়া পড়ে। সাহিত্য-ধর্ম্মবিবর্জ্জিত সাহিত্যই স্বল্পায়ু। সাহিত্য লোকশিক্ষক, ইহাতে প্রেম ভক্তি ও ন্যায়ান্যায়ের স্বরূপনির্ণয় হয় বলিয়া অমৃতময়। সাহিত্য জাতীয় মনের ও ধারণার পরিপোষ্টা। সেই হেতুই সাহিত্যে ধর্ম্মের প্রয়োজন—আর এই ধর্ম্মই সাহিত্যের ভিত্তি। যে ভিত্তি দেশকালপাত্রভেদে চিরদিন নিত্য সত্য বস্তু, তাহাই ভিত্তিরূপে গঠিত হওয়া উচিত। কোনও সময়বিশেষের নীতির উপর যদি কোন সাহিত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে সে সাহিত্যও স্বল্পবিস্তারী এবং যুগধর্ম্মপরিবর্ত্তনের সঙ্গে পরিবর্ত্তনশীল। এ যুগে যাহা সুনীতি বলিয়া গণ্য হইতেছে, অন্য যুগে তাহা গভীর দুর্নীতিদুষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। সুতরাং সে যুগে এই পূর্ব্বকালের সাহিত্যও অপাঠ্য হইয়া পড়ে।

সাহিত্যের ভিত্তি সার্ব্বজনীন মনুষ্যধর্ম্মের উপর হওয়াই উচিত। এ ধর্ম্ম যেন আবার সাম্প্রদায়িক না হয়। কারণ সাহিত্য সম্প্রদায়-বিশেষের নহে। এ ধর্ম্ম বিশ্বজনীন। যে সাহিত্যের এই ধর্ম্মই ভিত্তি, সে সাহিত্যের বিনাশ নাই। কারণ, ধর্ম্মের বিনাশ বা পরিবর্ত্তন শীঘ্র সম্ভব নহে। যদি তাহা হইত, তবে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া অজস্র অত্যাচারের ঝঞ্ঝা শির পাতিয়া সহ্য করিয়া, আজও হিন্দুধর্ম্ম জীবিত থাকিত না। অনার্য্যের সহিত সংঘাতে, বৌদ্ধের সহিত সংঘাতে, মুসলমানের সহিত সংঘাতে, খৃষ্টানের সহিত সংঘাতে—সমস্ত সংঘাতেই হিন্দুধর্ম্ম বিজয়ী। স্থিতিস্থাপক হিন্দুধর্ম্ম তাই আজও অক্ষুণ্ণ।

আমরা ভারতের নর-নারী। ভারতের জল, বায়ু, বিশ্বাস, সভ্যতা ও ধর্ম্ম আমাদের মেদমজ্জায়। আজ যে আমরা য়ূরোপীয় আদর্শে কাব্য নাটকাদি রচনা করিতেছি, ইহা আমাদের আজ কালই ভাল লাগিতেছে। কিছুদিন পরে এই সব রচনা কি আমাদের বংশধরদের ভাল লাগিবে? মুসলমান্ আদর্শে রচিত বাঙ্গলা রচনাগুলি কি এখন আমাদের আর ভাল লাগে? তাই বলিতেছি, সাহিত্য শাশ্বত, ক্ষণিক নহে। সাহিত্যের যে ধাতু, তাহাও একটি শাশ্বত বস্তুতে গঠিত হওয়াই প্রয়োজনীয়। এই জন্যই আজও বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস কৃষ্ণদাস গোবিন্দ-দাস ও সুরদাস প্রভৃতি বাঙ্গালী কবির গীতগাথা, কালিদাস ভারবি জয়দেব প্রভৃতি সংস্কৃতকবির কাব্যগাথা, ওমর হাফেজ প্রভৃতির কাব্য রসোচ্ছ্বাস, সেক্সপীয়ার শেলী ওয়ার্ডসওয়ার্থের অপূর্ব্ব কাব্যরস হৃদয়ে আপনার ঐশ্বর্য্যে উচ্ছলিত হইয়া, আপামরসাধারণকে আত্মবিস্মৃত করিয়া দেয়। সাহিত্যের এই ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিতে, কবি ভারতচন্দ্র 'বিদ্যাসুন্দর'কেও ধর্ম্মের মেরুদণ্ড দিয়াছেন।

ধর্ম্মে ও সাহিত্যে যে কত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সামান্য আলোচনা করিলেই তাহা সুস্পষ্ট হয়। ধর্ম্মের বিপ্লবেই ভাষা ও সাহিত্যের বিপ্লব সাধিত হয়। হিন্দুধর্ম্মের পূর্ণ বিকাশের দিনে সংস্কৃত ভাষারই বহুল প্রচলন ছিল এবং সেই সময়েই সংস্কৃত ভাষার চরমোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে পালি ভাষার দিন পড়িল: বুদ্ধদেব তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীকে আদেশ করিলেন, কেহ যেন তাঁহার উপদেশ সংস্কৃত ভাষায় না অনুবাদ করে, করিলে সে অপরাধী হইবে। মুসলমানশাসনের দিনে উর্দ্দু ও ফারশী ভাষার দিন আসিয়াছিল। আবার ইংরাজের আমলে ইংরাজীরই প্রচলন

হইয়াছে। মুসলমানের ভাষা, ইংরাজের ভাষা ও পূর্ব্বের সংস্কৃত মিলিয়া বাঙ্গলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে সন্দেহ নাই। য়ুরোপেও দেখা যায়, রোমান ধর্ম্মযাজকদিগের প্রভুত্বকালে ল্যাটিন ভাষার প্রচলন ছিল। রোমান যাজকদের আধিপত্যশেষের সঙ্গে সঙ্গে ল্যাটিন ভাষাও লোকে বিস্মৃত হইল। এখন আমাদের ধর্ম্মেও যেরূপ স্বেচ্ছাচার, ভাষাতেও সেইরূপ স্বেচ্ছাচার পরিদৃষ্ট হইতেছে।

পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। তাই সমস্ত প্রাচীন কবিদিগের কাব্যের আখ্যানবস্তু ছিল পৌরাণিক। তাঁহাদের স্বীয় অসাধারণ মনস্বিতার ও কৌশল-কলাময়ী উদ্ভাবনী শক্তির বৈচিত্র্যগুণে স্ব স্ব কাব্যকে তাঁহারা অভিনব-সুন্দর করিয়াছেন। এই অভিনবতা ও সৌন্দর্য্যসাধনই কবির মৌলিকতা। এই মৌলিকতার জন্য কালিদাস, ভবভূতি, ভারবি, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, ঘনরাম, কবিকঙ্কন, ভারতচন্দ্র যেন অদ্যাপি জীবিত—কিন্তু সে দিনের রঙ্গলাল ও বিহারীলাল আজ সান্দ্র বিস্মৃতিতে অন্তর্হিত।

এই ধর্ম্মবিহীন, ধাতুবিহীন ও ভক্তিবিহীন সাহিত্যই এখন আমাদের বঙ্গসাহিত্য। পূর্ব্বের মত কবি ও লেখক এখন আর কয়েকজনমাত্রে সীমাবদ্ধ নহে। সকলেই এখন ন্যূনাধিক সাহিত্যিক। সকলেই ইংরাজী শিক্ষার বিচিত্র কুহকে মন্ত্রমুগ্ধ। ইংরাজী ধরণে লেখা না হইলে কেহ পড়ে না। এই জন্য লেখকগণও রচনা কাটাইতে ও আশু যশোলাভ করিতে—স্বেচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক—ইংরাজী ধরণেরই পক্ষপাতী। কাজেই এতদিনের সে সনাতন ধাতু ও সাহিত্যের সহজ ক্ষমতা তিরোহিত হইয়াছে। যাহা হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা যে শুধু বর্ত্তমানের জন্যই লিখিত, এ সিদ্ধান্তে সহজেই উপনীত হওয়া যায়। বাঙ্গলার কোন

কাব্য বা রচনা নূতন প্রকাশিত হইলেই আমরা তাহাকে সেই শ্রেণীর ইংরাজী লেখার সঙ্গে, এমন কি বাঙ্গালী কবিকেও ইংরাজকবির সহিত তুলিত করি। এই অতুলন তুলনাশক্তির বিচিত্র উর্ব্বরতার ফলেই আমরা মনস্বী বঙ্কিমচন্দ্রে স্কটকে দেখিয়াছি, নবীনচন্দ্রে বায়রণকে পাইয়াছি, হেমচন্দ্রে টেনিসনের ও দান্তের আভাস পাইয়াছি, মধুসূদনে মিল্‌টন পাইয়াছি ও রবীন্দ্রনাথে শেলীকে পাইয়াছি। আমরা মেঘনাদ বধে 'প্যারাডাইস লষ্টে'র গন্ধ পাই, দুর্গেশনন্দিনীতে 'আইভানহো'র ছায়া দেখি—বৃত্রসংহারে 'ইন্‌ফার্ণো'র নমুনা মিলে। সম্পূর্ণ না পাইলেও জোর করিয়া যেন কতকটা পাইতেই হইবে। এই প্রাপ্তিই যেন আমাদের চরমোৎকর্ষের পরিচায়ক! বিলাতের ওকবৃক্ষ ও ভারতের বটবৃক্ষ যথাক্রমে বিলাতে ও ভারতেই সম্ভব। ভারতের পারিজাত ও বিলাতের লিলি কখনই এক নহে, হইতেও পারে না। তবুও বিলাতী বিদ্যা-বিপুলতায় আমরা এমনই সমদর্শী ও বিলাতী সভ্যতার তীব্র মাদকতায় এমনই অন্ধ যে, আমরা সোণার পাথরবাটী গড়িয়া বসিয়া আছি। এই অনুচিকীর্ষাই ভারতের কাল। যতদিন সাহিত্যে এইরূপ "যেচে মান" লইতে হইবে, ততদিন এ পঙ্গু সাহিত্যের ব্যাধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইবে।

বঙ্গদেশের বরেণ্য সন্তান স্বর্গীয় ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন :—

"আমি ইংরাজী বহি পড়িতাম ও ইংরাজীতে অনেক সময় বাধ্য হইয়া পত্রাদি লিখিতাম বটে, কিন্তু ইংরাজ ভিন্ন কাহারও সহিত ইংরাজীতে কথা কহিতাম না। আর ইংরাজীতে চিন্তা করিবার নিমিত্ত ত কখনই চেষ্টা করি নাই। প্রত্যুতঃ যদি কখনও চিন্তাকালীন পাঁপ্‌ড়ি-ভাঙ্গা ইংরাজী গৎ মনে হইতেছে বুঝিতে পারিতাম, তৎক্ষণাৎ তাহা মাতৃভাষায় অনুবাদ করিয়া বুঝিতাম, ভাবগুলি যথার্থ কি না?"

—পারিবারিক প্রবন্ধ, ৪৩ পৃষ্ঠা।

বঙ্গভাষার স্রোত এক্ষণে অন্যদিকে প্রবাহিত। আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে একটি কোন নির্দ্দিষ্ট রীতি নাই। যাঁহার যেরূপ ইচ্ছা, তিনি সেইরূপ গড়িয়া লইতেছেন। এ ভাষা রাজভাষা নহে, সুতরাং রাজদরবারে ও আইন-আদালতেও এ ভাষা চলে না; শিক্ষিতসমাজ এ ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতে এবং চিঠিপত্রাদি লিখিতে সঙ্কুচিত হয়েন; দোকানদার ব্যবসায়ীরা এ ভাষার অন্যরূপ সংস্করণ করিয়া লইয়াছেন; ভদ্রসমাজে অন্য একরূপ; ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা এ ভাষার অন্যবিধ রূপের উপাসনা করেন। সুতরাং ইহা যে শ্লথ-শাসন দুরন্ত বালকের মত উচ্ছৃঙ্খল হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। আধুনিক শিক্ষিতসমাজ কাব্যামোদের জন্য মিল্টন, বায়রণ, শেক্‌স্‌পিয়র, শেলীর কাব্যগ্রন্থের শরণাগত হয়েন; শিশুদিগকেও বর্ণবোধের পূর্ব্বে ফার্ষ্ট বুক পড়ান হয়। রচনায় বিদেশীয় কবিগণের প্রবচন প্রচুর পরিমাণে তুলিতে পারিবেন, কিন্তু আমাদিগের বঙ্গ বা সংস্কৃত সাহিত্য-রত্নাকর হইতে তাঁহারা একটি ক্ষুদ্র বালুকণাও তুলিতে পারিবেন না। এমন কি, একদিন বঙ্গের উজ্জ্বলতম রত্ন মধুসূদনই বলিয়াছিলেন যে, "বাঙ্গলা ভাষা ভুলিয়া যাওয়াই ভাল।" কিন্তু তিনিই শেষে খেদোক্তি করিয়াছিলেন "হে বঙ্গ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন।" এ খেদোক্তিটি আমাদের অনুশীলনের যোগ্য। তাই বলিতেছি, বাঙ্গলা ভাষার কে আদর করে? নব্য শিক্ষিতের দল ইহা পড়েন না; ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সংস্কৃতের চর্চ্চা করেন; বাঙ্গালী মুসলমানগণ সাদী-হাফেজ লইয়া থাকেন। বঙ্গভাষা এক্ষণে একটি নব্যশিক্ষিত দলেরই একমাত্র ক্রীড়নক। ভাষারও সঙ্করত্ব আছে। বঙ্গভাষাতেও সেই সঙ্করত্ব পৌছিয়াছে। "সঙ্করোনরকায়ৈব!" ভাষা-জননীর এখন ফার্সী-হিন্দি-ইংরাজী-সংস্কৃত বিমিশ্রিত এক অভিনব মূর্ত্তি।

গৌড়ীয় যুগে বঙ্গ-সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। তখনই স্বাধীন নৃপতিগণ ও দেশের ধনিগণ সাহিত্যের মর্ম্ম বুঝিতেন। এক এক জন মহাত্মা এক বা ততোধিক কবির পৃষ্ঠপোষক থাকিতেন। যেমন কৃত্তিবাসের তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণ, কবীন্দ্রের নস্‌রৎ খাঁ, বিদ্যাপতির শিবসিংহ, বিজয়গুপ্তের হোসেন শাহ, ষষ্ঠীবরের জগদানন্দ, মুকুন্দরামের রঘুনাথ দেব, রামেশ্বরের যশোমন্ত সিংহ, অনন্তরামের বিশারদ, রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের কৃষ্ণচন্দ্র, কবি আলোয়ালের মাগন ঠাকুর, ভবানীদাসের জয়চন্দ্র। তাই সাহিত্যেরও পরিপুষ্টি সম্ভবপর হইয়াছিল। আর সে দিনও নাই, সাহিত্যের সে উন্নতিও নাই।

সাহিত্যের বিকাশ দুই দিকে, গদ্যে এবং পদ্যে। পূর্ব্বে গদ্য একরকম ছিল না বলিলেই হয়। যাহা রচিত হইত, সমুদায় পদ্যেই হইত। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগরমহাশয় ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার-প্রমুখ জনকয়েক মহাত্মার যত্নেই প্রথম সুমার্জ্জিত গদ্য-সাহিত্যের উদ্ভব হয়। সেই গদ্য আজও পঠিত এবং পাঠিত হইতেছে। সেই গদ্যই মধুসূদন, হেমচন্দ্র, রজনীকান্ত, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃকও গ্রাহ্য হইয়াছে।

কিন্তু আজকাল আর সে দিন নাই। আজকাল বিজ্ঞানের দিন, প্রত্নতত্ত্বের দিন, মৌলিক অনুসন্ধানের দিন, কিন্তু বিশুদ্ধ সাহিত্যিকের অভাব! ভাষার পবিত্রতা নাই, রীতিও নাই। বঙ্গভাষা, সাহিত্য এবং বঙ্গদেশের ইতিহাসে বিদেশী পণ্ডিতগণের অপূর্ব্ব ধীশক্তিবলে আমরা জানিতে পারি : পলাশীর যুদ্ধের পর জনকয়েক নিষ্কর্ম্মা ব্রাহ্মণ কূটরাজনীতি চরিতার্থ করিতে এই সংস্কৃত ভাষার সৃষ্টি করিয়াছিল

(Dugald Stewart) ; ঋগ্বেদ চাষার গান ; গৌড়ীয় ভাষাগুলি কোন অনার্য্য ভাষা হইতে নিঃসৃত হইয়া, সংস্কৃত অভিধানের সাহায্যে পুষ্ট হইয়াছে ; বুদ্ধ কোন লোক বিশেষের নাম নহে ; কাশ্মীরাধিপ মাতৃগুপ্ত ও কালিদাস একই ব্যক্তি। ('বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' হইতে উদ্ধৃত কোন লোকবিশেষের মত)—প্রত্নতত্ত্বের নমুনা এই। বঙ্কিম-চন্দ্রের "স্পেশালের পত্র" ও "রামায়ণের সমালোচনা" তবে কল্পনা-সম্ভূত বলি কিরূপে ? প্রত্নতত্ত্বে যে তথ্য বাহির হয় হউক, কিন্তু তৎসঙ্গে লিখিত ভাষার একটি শৃঙ্খলা ও নিয়ম বিধিবদ্ধ হওয়া উচিত। কথিত ভাষা দেশকালভেদে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে এবং হয়ও ; সেইজন্য কথিত ভাষাকে সাহিত্যে স্থান দান করা যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না।

কথিত ও লিখিত ভাষার মধ্যে চিরন্তন প্রভেদ সকল দেশেই আছে। সাহিত্যের ভাষাই ভাষা-শিক্ষার প্রধান বাহন। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন, "লিখিত ও কথিত ভাষার মধ্যে একটা প্রভেদ আছে ও চিরকালই থাকিবে।"

শ্রীযুক্ত দামোদর মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন,

"এক শ্রেণীর লেখক কেবলমাত্র প্রচলিত কথায় রচনার পক্ষপাতী ; সংস্কৃতের ও প্রাকৃতের সহিত বঙ্গভাষার যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে, তাহার উচ্ছেদ করিতে তাঁহারা প্রয়াসী। সত্যকে সত্যি এবং মিথ্যাকে মিথ্যে, সূর্য্যকে সুজ্জি এবং রৌদ্রকে রদ্দুর লেখা তাঁহাদের অভিপ্রায় ! লিখিত ভাষায় এরূপ পরিবর্ত্তনের কোনই আবশ্যক আমরা বুঝিতে পারি না। কথোপকথনের ভাষার সহিত লিখিত ভাষার পার্থক্য থাকা আবশ্যক। ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্য জনপদের ভাষাতেও এইরূপ পার্থক্য সযত্নে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে।"

—প্রবাহ, মাঘ, ১৩১১

এ কথা নিশ্চিত সত্য, কারণ দেখা যাইতেছে, কালিদাস লিখিবার সময় লিখিয়াছেন, "বালেন্দুবক্র পলাশপর্ণ" কিন্তু কথিত ভাষাতেও কি

ঐরূপ প্রয়োগ করিতেন? জয়দেব কেশর ফুলকে নিশ্চয়ই কেশর ফুল বলিতেন; কিন্তু লিখিয়াছেন, "মদনমহীপতিকনকদণ্ডরুচি।" মধুসূদন মর্ত্ত্যকে মর্ত্তই বলিতেন; কিন্তু লিখিয়াছেন, "উর্ব্বীধাম।" তাই বলিয়া Beamesএর মতে কথনের ভাষা সাহিত্যের অঙ্গে শোভা পায়, ইহা কি সঙ্গত? তাহা যদি হয়, তবে শুধু রাজধানীর কথাই চলিবে কেন? আমাদের উভয় বঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন জেলায় ভিন্ন ভিন্ন ভাষার প্রচলন আছে; সেগুলি তবে না চলিবে কেন? যদি নব্য মতে "কোনো", "মতো," "যাচ্ছি," "গেলুম" চলে, তবে ঢাকার "ক্যান" শ্রীহট্টের "গ্যাছলাম," "যাইবাম্" যশোহরের "খাতি পালাম না," বর্দ্ধমানের "ক্যানে গেইচি," নদীয়ার "ইন্‌ছিল," বীরভূম ও মানভূম অঞ্চলের চন্দ্রবিন্দুবহুল ভাষাই বা না চলিবে কেন? তবেই বঙ্গভাষা হইবেন বহুরূপিনী। যে প্রদেশীয় লোকের রচনা, সে রচনা শুধু সেই প্রদেশেই বিচরণ করিবে। অন্য প্রদেশের লোক যে অন্য প্রদেশের চলিত কথা সব বুঝিবেন, তাহা মনে করা অত্যন্ত অযৌক্তিক। সুতরাং তখন সাহিত্যও প্রত্যেক জেলায় ভিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িবে। এই জন্য, দেশের নানা অংশের বিভিন্ন কথিত ভাষার প্রণালীর একীকরণ ও সামঞ্জস্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে, সাহিত্যের এই স্বাতন্ত্র্যটুকু অতীব প্রয়োজনীয়। এ স্বাতন্ত্র্য আভিধানিক বিশুদ্ধ ভাষা প্রয়োগেই সম্ভব।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ 'শব্দতত্ত্বে' প্রতিপন্ন করিয়াছেন—"কাঁকুড়" হইতে "কাঁক্‌রোল" শব্দ উৎপন্ন! অথচ "কাঁকুড়" ও "কাঁক্‌রোল" দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক পদার্থ। ইহাদের স্বাদ, আকার, এবং বাহ্য ও আভ্যন্তরিক গঠনও সম্পূর্ণ পৃথক। প্রাকৃত ভাষায় "পাঁচন" ও "উনান" "অন্" ও "আন" প্রত্যয়ে সিদ্ধ। ইহারা যে ফার্সী কথা,

এ বোধ হয় তাঁহার জানা নাই। আরও আছে, যথা—"আক্কেলমন্ত" হইল "চালাকীমন্ত" হইল না কেন? "খাতাঞ্চি" "চি" প্রত্যয়ে সিদ্ধ। ফার্সী কথাগুলিকে এরূপভাবে সিদ্ধ করিতে গিয়া, দগ্ধ না করিলেই ভাল হইত। কথাটি "আক্কেলমন্ত" নহে, আসল কথা "আক্কেলমন্দ", যেমন "দৌলৎমন্দ" "দানেশমন্দ।" যাহাই হউক, এরূপ ব্যাকরণে ভাষার কি উন্নতি সাধিত হইতে পারে? আমি বুঝিতেছি, এরূপ ভাষা বাঙ্গলায় প্রচলিত হইলে প্রকৃত অনিষ্টই সাধিত হইবে। কারণ এইরূপ এক একটি বৈদেশিক শব্দ আসিয়া, বঙ্গভাষা হইতে এক একটি শব্দ চুরি করিয়া লইলে, ক্রমে ক্রমে বঙ্গভাষার মধ্যে আর বাঙ্গলা শব্দই থাকিবে না। অতএব এখন হইতেই এ প্রথার যাহাতে প্রসাররোধ হয় সাহিত্যিকদের সেই চেষ্টাই করা উচিত। এভাবে 'শব্দতত্ত্ব' ভাষার কোনই উপকার করিবে না। বরং ভবিষ্যতে ছাত্রদিগকে আর সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্র, সন্ধি, তদ্ধিত বা ধাতুরূপ মুখস্থ হয় নাই বলিয়া, পণ্ডিত মহাশয়ের ঘণ্টায় বিশেষ প্রয়োজনে অনুপস্থিত থাকিতে হইবে না।

আমার বক্তব্যগুলি আরও বিশদভাবে বলিতেছি।

প্রথমত, যে সমস্ত প্রক্ষিপ্ত বৈদেশিক শব্দ এই ভাবে বঙ্গভাষায় আসিয়া পড়িয়াছে, সেগুলি যতদূর সম্ভব পরিত্যাগ করিয়া, তাহাদের স্থানে সুমার্জ্জিত সংস্কৃত বা বাংলা শব্দ লইলে ক্ষতি কি?

দ্বিতীয়ত, আমাদের স্বীয় ভাব প্রকাশ করিতে পরের দ্বারে ভাষা ভিক্ষা করা কি বাঞ্ছনীয়? এই ভাষাভিক্ষাতেই বঙ্গসাহিত্যের আজিও পূর্ণ উন্নতি সম্ভব হয় নাই।

তৃতীয়ত, ঐ ধার-করা শব্দগুলিকে মাজিয়া ঘসিয়া সাহিত্যে চালাইবার পন্থা করিয়া দেওয়াই কি সাহিত্য-সেবা ?

স্বর্গীয় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের কথায় বলিতে গেলে "মড়াদাহ" "শবপোড়া" ভাষাই এই আধুনিক বঙ্গভাষা। যদি আমাদের সাহিত্যিকগণ মনস্বিতার পরিচয় দিয়া এই সকল বৈদেশিক বাক্যগুলি বাহির করিয়া তাহাদের সমার্থবাচক বাঙ্গলা প্রতিশব্দ প্রকাশ করিতেন, তবে তাহাতে ভাষার প্রভুত মঙ্গলই সাধিত হইতে পারিত। বাঙ্গলা অক্ষরে লিখিলেই তাহা বাঙ্গলা হয় না! এই সব বৈদেশিক শব্দের সম্মিলনে যে বঙ্গভাষা সৃষ্ট হইতেছে, সে ভাষার কোনই নিয়ম বা শৃঙ্খলা নাই, ব্যাকরণ নাই, স্বাতন্ত্র্য নাই। যদি বঙ্গভাষায় অনভিজ্ঞ কোন ব্যক্তি বঙ্গভাষা শিখিতে চাহেন, তিনি কিছুই শিখিতে পারিবেন না। বরং তিনি দেখিবেন যে, বঙ্গভাষা বহু ভাষার সংমিশ্রণে একটি অদ্ভুত ভাষা-সঙ্কর। কিছুদিন পরেই হয় ত কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ বলিবেন, বঙ্গদেশে মুসলমান্ ও ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বে কোন ভাষাই ছিল না! কিম্বা তিনি Bishop Caldwell, Anderson, Latham, Kay প্রভৃতির সহিত একমতাবলম্বী হইয়া বলিবেন যে, বাঙ্গলাও সংস্কৃতের মত অনার্য্য জাতির এক দুর্ব্বোধ্য ভাষা!

এই স্বেচ্ছাকৃত বিশুদ্ধিহানির ফলে সাহিত্যে স্বেচ্ছাচার দিন দিন প্রবল হইতেছে এবং ফলে ভাষা ও সাহিত্যে এক বিষম বিশৃঙ্খলা আসিয়া পড়িয়াছে।

ভাষায় ঈদৃশ স্বেচ্ছাচারের যুগে অবশ্য ব্যাকরণ রচনা সম্ভব নয়। আর বাস্তবিক নাইও। কারণ, দেশে যখন রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হয়, তখন

যেমন কেহ আইন মানে না, সকলেই স্ব স্ব প্রধান হয়, তেমনই আজ ভাষা-বিপ্লবের দিনে ভাষার ব্যাকরণ ছাড়িয়া, সকলেই স্ব স্ব রচনা রক্ষা করিতেই সচেষ্ট।

অনেকে বলেন, ভাষায় ব্যাকরণ একটি প্রতিবন্ধক—অন্তরায়। ব্যাকরণ ভাষার অনুসরণকারী, ব্যাকরণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ভাষা চলিবে, ইহা বড়ই লজ্জার কথা। বন্ধন সকলেরই আছে: মনুষ্যের বন্ধন সমাজ, ভাষার বন্ধন ব্যাকরণ। ব্যাকরণ লেখকের স্বাধীনতাপহারী নহে, ভাষার স্বেচ্ছাচারজনিত যে উচ্ছৃঙ্খলতা জন্মে, ব্যাকরণ তাহাই নিবারণ করে। ব্যাকরণ ভাষার তুলাদণ্ড, অনাগত যুগের পাঠকদিগের শিক্ষক ও বোধয়িতা। অপরিমিত স্বাধীনতায় উচ্ছৃঙ্খলতা আসে, সুতরাং এই অধীনতা স্থায়ী সুখের। স্বাধীনতা উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য নহে, স্বাধীনতা সাম্য ও সামঞ্জস্যের জন্য। সেই হেতু স্বাধীনতারও সীমা আছে।

ব্যাকরণের উপকারিতা, আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে সুস্পষ্ট উপলব্ধ হয়। সংস্কৃত ভাষা আমরা অতি কঠোর মনে করি। কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধানের সাহায্যে আমরা তাহা অতি সহজেই বুঝিতে পারি। যদি এই সংস্কৃত সাহিত্য বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের মত বিপথগামী হইত, তাহা হইলে আজ বোধ হয়, আমরা এ রসজলধি হইতে একবিন্দু রসও তুলিতে পারিতাম না। এই আমার দুঃখ যে, তথাকথিত "কঠোর" সংস্কৃত ভাষা বুঝিতে পারি, বৈদেশিক ভাষাও বুঝিতে পারি, কিন্তু আমার মাতৃভাষা বঙ্গভাষার আধুনিক সাহিত্যগুলি সম্যক্ বুঝিতে পারি না। তবে কি বলিব যে, সংস্কৃত ভাষা ব্যাকরণ মানিয়া চলে বলিয়া উহাতে স্বাধীন কবিত্ব বা কল্পনার উন্মাদিনী ক্ষমতা নাই? আর বঙ্গভাষা ব্যাকরণ

মানে না বলিয়া, উহার স্বাধীন কবিত্ব আমাদের বুঝিবার শক্তি নাই? হয় ত তাহাই। সংস্কৃত ভাষা অনুচ্ছৃঙ্খল-স্বাধীন, আর বাঙ্গলা ভাষা উচ্ছৃঙ্খল-স্বাধীন।

ব্যাকরণ অবহেলায় যে বিষময় ফল উৎপন্ন হইতে পারে, তাহার কয়েকটি উদাহরণ আমি কয়েকজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের রচনা হইতেই উদ্ধৃত করিতেছি। ১৩১২ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'ভাণ্ডারে' শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন—"উন্মাদিনী কেশরী।" ১৩১২ সালের 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত মহাশয়ের একখানি পুস্তকের সমালোচনায় দেখিয়াছি, লেখক "শ্বশুর" বুঝাইতে "শ্বশ্রুদেব" পদ প্রয়োগ করিয়াছেন। এরূপ ভাষা যদি চলিতে পারে, তবে 'হুতোম প্যাঁচার' ভাষা বা 'আলালের ঘরের দুলালের' ভাষা কোন্ দোষে নির্ব্বাসিত হইল? ভাবগোপনের জন্যই যদি ভাষার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ইহাঁরা এই বাক্যের সার্থকতাই প্রতিপন্ন করিতেছেন, স্বীকার করিতে হইবে।

যাহা হউক, শাসনের শৃঙ্খলা যেমন আইন রাখে, ভাষার শৃঙ্খলাও তেমনি ব্যাকরণ রাখে। অতএব ভাষার শৃঙ্খলা ও রীতি অক্ষুণ্ণ রাখিতে যে ব্যাকরণের প্রয়োজন, এ কথা অস্বীকার করিলে চলিবে কেন? Grammar is the art of speaking and writing correctly "ব্যাক্রিয়ন্তে অনেন ইতি ব্যাকরণম্"। ভাষার বিশুদ্ধ প্রয়োগকল্পে ব্যাকরণের প্রয়োজন। ইহার উপরেও যদি কেহ বলেন, মাতৃভাষা শিখিতে ব্যাকরণ অনাবশ্যক, তাহা হইলে তাঁহার সহিত মতভেদ অনিবার্য্য।

মাতৃভাষার দুইটি স্তর আছে, এক লিখিত ভাষা, অন্য কথিত ভাষা।

কথিত ভাষার জন্য ব্যাকরণের প্রয়োজন না হইতে পারে, কারণ কথিত ভাষা সাময়িক ও স্থানিক, কিন্তু লিখিত ভাষা স্থায়ী, তাহার জন্যই ব্যাকরণ। যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে কোনও দেশেই মাতৃভাষার জন্য ব্যাকরণ প্রণীত হইত না।

কেহ কেহ বলেন যে, আমাদের এখনও ব্যাকরণ-প্রণয়নের সময় হয় নাই। একথাও ভুল। কারণ, এমন কোন্ অবস্থা আছে, যে-অবস্থায় শুদ্ধ ভাষার প্রয়োগ প্রয়োজনীয় বলিয়া গণ্য নহে? যে-ভাবে যে-প্রণালীতে শব্দ প্রযুক্ত হইলে শ্রুতিমাত্রেই তাহার অর্থ বোধ হয়, তাহাকে বৈয়াকরণগণ শুদ্ধ প্রয়োগ বলেন। বৈয়াকরণগণ সেইরূপ প্রচলিত শুদ্ধ প্রয়োগগুলিকেই লিপিবদ্ধ করেন ও তাহাই ব্যাকরণ বলিয়া বিখ্যাত হয়। এই ব্যাকরণ-প্রণয়নে যতই বিলম্ব হইবে, ততই আরও ব্যতিক্রম আসিয়া জুটিবে। কিন্তু একবার বৈয়াকরণিক নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ হইলে, আর তাহা লঙ্ঘন করা হয়ত তত সহজ হইবে না। আমার বোধ হয়, বাঙ্গলার ব্যাকরণসূত্রে যে এত ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়, শুধু ব্যাকরণ-প্রণয়নে বিলম্বই তাহার একমাত্র কারণ। যত অধিক বিলম্ব হইবে, ততই সূত্র ও ব্যতিক্রমভার অধিক হইয়া পড়িবে।

আবার কেহ কেহ বলেন যে, ব্যাকরণ দিয়া বন্ধন দিলে ভাষার স্বাধীনতা বন্ধ হইবে! অতএব ব্যাকরণ হওয়া উচিত নহে। এ যুক্তিও সম্পূর্ণ অসার। পরাধীন আমরা, আমাদের ধারণা উচ্ছৃঙ্খলতাই স্বাধীনতা! সকল দেশই ব্যাকরণ মানিয়া চলে। তবে কি সে সকল দেশে ভাষার অবাধ প্রবাহ রুদ্ধ? মানুষকে সংযত করিতে এযাবৎ অনেক ধর্ম্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, ব্যবহারশাস্ত্র, শাসনশাস্ত্র প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়াছে, কিন্তু মানুষ কি সংযত

ও নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে ? অনেকে হইয়াছে, অনেকে হয় নাই। যাহারা হয় নাই, তাহারাও হইবে ; অন্তত শাসন-শাস্ত্রের ইহাই উদ্দেশ্য। তাই বলিয়া কি বলিতে হইবে যে, ধর্ম্মশাস্ত্রাদির কোন প্রয়োজন নাই ?

শিশুকে প্রথম চলিতে শিক্ষা দিবার সময় যেমন তাহাকে হাত ধরিয়া চালাইতে হয়, তাহাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিলে তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী, সেইরূপ শিশু বঙ্গভাষাকে এখন সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়াও কোন মতেই উচিত নহে। এতদিন বঙ্গভাষা সংস্কতের নিকটে থাকিয়া সংস্কৃত ভাবেই অনুপ্রাণিত হইয়াছে। কাজেই সংস্কৃত ব্যাকরণের আদর্শে এতদিন বাংলা চলিয়াছে। কিন্তু এখন বাংলা ভাষা সেরূপ সংস্কৃত-ঘেঁসা যখন আর নাই এবং এটি স্বতন্ত্র বাংলা ভাষায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তখন ইহার জন্য স্বতন্ত্র বাংলা ব্যাকরণেরও প্রয়োজন হইয়াছে।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়েরও ইচ্ছা, বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা ব্যাকরণকে সংস্কৃত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করেন। তিনটি স (শ ষ স) দুইটি ন (ণ ন) দুইটি জ (য জ) উঠাইয়া দেন। ইহাতে বঙ্গভাষার কি উপকার হইবে ? আর সংস্কতের সহিত বঙ্গভাষার সম্বন্ধ থাকিলেই বা বঙ্গভাষার কি অনিষ্ট হইতেছে ? সংস্কতের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়াই ত বাঙ্গলা ভাষা থাকিতে পারে, ত্যাগ করিলে কি করিয়া থাকে ?

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন যে, বাঙ্গলা ভাষা প্রাকৃতের কন্যা, অতএব প্রাকৃত ব্যাকরণমতে বাঙ্গলা ভাষা গঠিত হউক। ইহাতেই বা কি লাভ ? সতীশবাবু প্রচলিত কথিত ও প্রাদেশিক ভাবার একশত পৃষ্ঠাব্যাপী এক সুদীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন ; তাহার দ্বারা প্রচলিত শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থশিক্ষার পথ

সুগম করিয়া দিয়াছেন, সন্দেহ নাই। পাঠকের কৌতূহলনিবারণার্থ কয়েকটি দৃষ্টান্ত এই স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি। রেলের গাড়ী = রেলগাড়ী ; গোরাদের জন্য বাজার = গোরাবাজার ; ঠাকুর অর্থাৎ পূজনীয় দাদা = ঠাকুরদাদা ; বাবাই অর্থাৎ পুত্রাদিই জীবন = বাবাজীবন, জলের অর্থাৎ মাছের ন্যায় জীবন্ত = জলজীবন্ত ইত্যাদি !! যাহা হউক, গোরাবাজার যেরূপ সমাস হইল (তৎপুরুষ), বৌবাজার, শ্যামবাজার, ফিরিঙ্গিবাজার, কক্স্‌বাজারও কি সেইরূপ তৎপুরুষ সমাস ? সাহিত্যের ভাষার জন্যই ব্যাকরণ সৃষ্ট হয় ; প্রচলিত কথোপকথনের ভাষার জন্য হইলে এইরূপ হাস্যরসই সমধিক উদ্রেক করিবে।

এদিকে আবার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় বাঙ্গলায় যুক্তাক্ষর উঠাইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। তবেই দেখা যাইতেছে—যাঁহার যাহা ইচ্ছা, তিনি তাহাই কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। এইরূপ সাহিত্যে শব্দকে প্রবেশাধিকার দিয়া, যুক্তাক্ষর উঠাইয়া দিয়া ও ভাষাকে ব্যাকরণবন্ধনমুক্ত করিয়া, বৈদেশিক ভাষাকে সাহিত্যে আসিতে দিয়া, বাঙ্গলা সাহিত্যের উন্নতি ও অগ্রগতির পথে যে-সব কণ্টক রোপন করিতেছেন, অবিলম্বে তাহার মূলোৎপাটন প্রয়োজন।

আর্য্যাবর্ত্ত, মাঘ ও ফাল্গুন, ১৩১৭

পুরাতন বনাম নূতন বাঙ্গলা সাহিত্য

আজকাল কাগজ খুলিলেই দেখি, বঙ্গসাহিত্যের সমালোচনা। ধূয়া এক—বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্য খাঁটি বঙ্গীয় নয়, উহাতে বাঙ্গালীর প্রাণের সহজ সত্যটি নাই, বাঙ্গালীর বিরাট সমাজ-দেহ হইতে বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্য সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন, ইহা বিদেশীয় অস্বাভাবিক এবং কৃত্রিম ইত্যাদি।

এই নব সাহিত্যে "জন সাধারণের ভাব, অভাব, আশা, আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের" কথা নাই। "আমাদের দেশের প্রাণশক্তির মিলনভূমি একমাত্র ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত; ধর্ম্ম ব্যতীত অপর কোনও বিষয়ে জনসাধারণের মিলিত হওয়া স্বাভাবিক নহে। আমরা আধ্যাত্মিক জাতি আমাদের দেশও আধ্যাত্মিক; একমাত্র ধর্ম্মই জনসাধারণকে একত্র করে। আমাদের দেশে সেইজন্য কেবল ধর্ম্মসাহিত্যই আছে, ইত্যাদি।"* এই কথাই আজকাল বারো-আনা সাহিত্য-সমালোচক খুব আস্ফালন করিয়া বলেন এবং উক্ত অভিমত সত্যসত্যই বিশ্বাস করেন কি না, জানি না। তবে বলিয়া যে বিশেষ গর্ব্ব অনুভব করেন, তাহা লেখা পড়িলেই দস্তুর-মত বুঝা যায়। সেই সমস্ত সমালোচক যদি সত্যসত্যই ঐ মত বিশ্বাস করেন—তাহা হইলে তাঁহারা কৃপার পাত্র বলিতে হইবে।

প্রথমেই বলিয়া রাখি, এই নব সাহিত্য রচিত হইয়াছে বলিয়াই,

---

* কোটেশন্-মধ্যস্থ বাক্যগুলি ১৩২৫ সালের পৌষের প্রবাসীতে প্রকাশিত "বঙ্গের পাঁচালী সাহিত্য" প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত।

অনেকের হাতে আজ কলম উঠিয়াছে। ইহা যদি না হইত, তাহা হইলে বর্ত্তমানের পনের আনা ন' পাই নেড়া বুনে' কীর্ত্তুনে বলিয়া বিখ্যাত বা কুখ্যাত হইতেন না!

দ্বিতীয় কথা—বাঙ্গলা সাহিত্য যদি আজ যুগের বার্ত্তাবহ না হইত, তাহা হইলে হয়ত সকলেই ইহার জন্য মাথাও ঘামাইতেন না।

তৃতীয় কথা—বাঙ্গলা সাহিত্যে এই নব ভাবগঙ্গা না আসিলে, অনেক অধুনা-বিজ্ঞ মুখর সমালোচক হয়ত আমরণ নির্ব্বাক হইয়াই থাকিতেন।

একটি কথা এই সমালোচকগণ বিস্মৃত হইয়াছেন। ইহারা যে-বাঙ্গলা দেশ, বাঙ্গালী, বাঙ্গলা সাহিত্য এবং বাঙ্গালীর আদর্শ সভ্যতা চিন্তাধারা ও সমাজ-ব্যবস্থা বর্ত্তমান কালের বাঙ্গালীর মধ্যেও দেখিতে চাহেন কিন্তু পাইতেছেন না বলিয়া আক্ষেপ করিতেছেন, সে-বাঙ্গলা দেশ, বাঙ্গালী ও বাঙ্গালীর কৃষ্টি, বহুদিন পূর্ব্বেই অন্তর্হিত হইয়াছে। উদ্বর্ত্তন না হইলেও পরিবর্ত্তনের ফলে, সে দেশের ও জাতির আমূল রূপান্তর ঘটিয়াছে। এ রূপান্তর ভাল কি মন্দ সে আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু পরিবর্ত্তন যে ঘটিয়াছে, সেটি সম্ভবত কেহই অস্বীকার করিবেন না। কাজেই এই পরিবর্ত্তিত দেশের ও জাতির গায়ে পুরাতন সেই কোটটি আর চলে না। হয়ত সেটি খুবই মূল্যবান ছিল, কিন্তু গায়ে না হইলে, কি করা যায়? খেলোই হউক বা ভালই হউক, নূতন কোটের এখন বিশেষ দরকার। বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গলা দেশ ও বাঙ্গালী জাতি নূতন, সুতরাং তাহার নূতন পরিবেশ ও নূতন ব্যবস্থারও প্রয়োজন।

জানি না, কোনও সমালোচক এ পর্য্যন্ত কোনও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন কি না যে, বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্য কিরূপ হওয়া চাই এবং এই সাহিত্যের

কোন্ খানটা অস্বাভাবিক, কৃত্রিম এবং বিদেশীয়! আর বাঙ্গলা সাহিত্যের ধাতুই বা কি? কোন্ কথাটি বাঙ্গালীর প্রাণের কথা? পূর্ব্বে কি খুব ভাল জিনিস ছিল, যাহা আজকাল নাই। সেই "জিনিস"-টা কি যাহার অভাবে বঙ্গসাহিত্য প্রাণহীন ইত্যাদি! যতদূর স্মরণ হয়, কেহই দয়া করিয়া তাহা করেন নাই—সকলেই (এত বিরোধের মধ্যেও) আশ্চর্য্যরূপ একমত যে—"নাঃ, এ বাঙ্গলা সাহিত্য কিছুই নাঃ।" যুক্তিহীন নিরুদ্দিষ্ট দায়িত্বহীন মতপ্রচারই, আজকাল মাসিক, দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রাদিতে ঝুড়ি ঝুড়ি প্রকাশিত হইতেছে!

এটা সকলেরই মনে রাখা উচিত যে, সে-কাল এ-কাল নয়। দেশে রাষ্ট্রে, সমাজে, ধর্ম্মে এবং ব্যক্তিত্বে এখন কি আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, এবং প্রতিদিন ঘটিতেছে। সাহিত্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও, কোথাও সেকালের সঙ্গে একালের এখন আর ঐক্য নাই। আচার, ব্যবহার, বিদ্যা, বুদ্ধি, আশা, আকাঙ্ক্ষা, জীবনযাত্রা, গার্হস্থ্যজীবন, লৌকিকতা, নিষ্ঠা, ধর্ম্ম, বিচার, অবস্থা কোন্টা ঠিক সেকালের মত? আর সেকালই বা কোন কাল? তাহারও একটা দস্তুরমত নির্দ্দেশ চাই ত, যে অমুক সাল পর্য্যন্ত সেকাল ছিল, আর তাহার পর হইতেই একাল আরম্ভ হইয়াছে! তাহাও এ পর্য্যন্ত কেহ করেন নাই। কেহ 'সেকাল,' কেহ 'পূর্ব্বে,' কেহ 'পুরাতন' এমনই এক একটা অনির্দ্দিষ্ট বাক্য ব্যবহার করিয়া থাকেন মাত্র।

আরও একটা মত ইহারা প্রচার করেন যে—সেকালের সবই (অন্ততঃ অধিকাংশই) কেমন আজ পর্য্যন্ত সমাদৃত হইতেছে!

এখন দেখা যাউক—এই সব কথার সারবত্তা কতখানি এবং কতখানি এগুলি সত্য।

সেকাল বলিতে না হয় ধরিয়া লইলাম ঈশ্বর গুপ্তর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত। বাঙ্গলার বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজ, এবং তদ্‌গুরু বঙ্কিমচন্দ্র বলেন যে, গুপ্ত কবিই সেকাল ও একালের মধ্যরেখা। বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যবিরোধীর দল হয়ত তাহা মানিবেন না—তা না মানুন্। ইহাঁরা বলেন, অতিবৃদ্ধপিতামহ-ঠাকুরের বহুমূল্য জামিয়ারটিই গায়ে দেওয়া কর্ত্তব্য, যদি কিছু গায়ে দিতেই হয়! হউক তাহা কীটদষ্ট শতজীর্ণ, না হয় তাহা অঙ্গে না-ই মানাইল!

এই 'সেকালে' কতগুলি গ্রন্থ রচিত হইয়াছে? আর তাহার কয়খানিই বা আজ পর্য্যন্ত 'সমাদৃত' হইতেছে—একথা কি একবার কেহ চিন্তা করেন? বোধ হয় একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে 'সেকালে'র বাংলা রচনার আজ এক সহস্রাংশও জীবিত নাই। যাহা আছে—তাহা কি? কতকগুলি বিক্ষিপ্ত পদ, কোনও একটা গ্রন্থের কতক অংশ অথবা কাহারও দুই চারি ছত্র—ইহা ছাড়া আর কি? 'সেকালে'র সমস্ত লেখাই যে আজ পর্য্যন্ত 'সমাদৃত' হইতেছে—এ কথা একেবারেই সত্য নহে।

লেখার বিষয় ছিল কি? "কানু ছাড়া গীত নাই"—চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি প্রভৃতি অমর বৈষ্ণব কবিগণের অক্ষম অনুকরণে কৃষ্ণ-রাধার কুৎসা! অথবা কাল্পনিক একটা (অপ?) দেবতার কাল্পনিক লীলা-কাহিনী! ইহা ছাড়া পুরাতন সাহিত্যে আর কি আছে? তান্ত্রিক যুগে রাধা-কৃষ্ণ গিয়া কালী-তারা আসিলেন। বৈষ্ণব যুগে কানু এবং চৈতন্য-পর যুগে গৌর! বঙ্গবাণীর জঠরে সারবান বলকারী কিছু পদার্থ গেল কি না ঠিক বলা যায় না—তবে জলপানে উদরপূর্ত্তির মত, পেট যে খুব পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

সে সাহিত্যে "ধর্ম্মের কথা" নাকি আছে—তাই আজ পর্য্যন্ত তাহা

জীবিত! ধর্ম্মকাহিনী কি আছে? বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস গোবিন্দদাস জ্ঞানদাস, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি ব্যতীত—সবই জঘন্য কুরুচিপূর্ণ কামকাহিনী রাধা-কৃষ্ণের ব-কলমে চলিয়া আসিতেছে!

ইহাই যদি ধর্ম্মকাহিনী হয়, তবে নাচার। আর উক্তরূপ কামকথা বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যে না থাকার দরুণ যদি সাহিত্যের সহিত বাঙ্গালী জাতির নাড়ীর যোগসূত্র ছিন্ন হয়, তাহা হউক—তাহাই বাঞ্ছনীয়।

চৈতন্যভাগবত, ভক্তমাল প্রভৃতি দুই একখানি গ্রন্থে তৎকালীন্ দেশ, দেশবাসী ও সমাজের কিঞ্চিৎ উল্লেখ আছে বটে—কিন্তু সমাজের প্রকৃত ছবি কোনও গ্রন্থে নাই। উপন্যাস গল্প প্রভৃতি কথাসাহিত্যেই সমাজের প্রকৃত ছবি দেওয়া বা পাওয়া সম্ভবপর—কিন্তু সেকালে রচিত কোনও কথাসাহিত্যের খবর অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই। মেঘনাদবধ বা বৃত্র-সংহারের মত কোনও কাব্যগ্রন্থও সেকালে রচিত হয় নাই।

A nation lives in cottages—কথাটা সত্য! জগতের কোন্ সাহিত্যে এপর্য্যন্ত কেবলমাত্র নিছক cottageএর কথাই nationএর পরিচয়ে প্রদত্ত হইয়াছে? আমাদের পুরাতন সাহিত্যেও যে তাহারই সমধিক আদর ছিল—তাহার পরিচয়ও ত এ পর্য্যন্ত বিশেষ পাওয়া যায় নাই। সত্য কথা বলিতে কি, মানুষের পরিচয়ই বড একটা পুরাতন সাহিত্যে নাই। কারণ মানুষ যেমনি মনুষ্যপদবাচ্য হইবার মত হইয়াছেন, অমনি তাহাকে অ-মানুষ করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে! তিনি একেবারে অবতার!! পূর্ব্বসাহিত্যে সমাজেরই বা এমন কি ইতিহাস আছে? যাহা আছে—তাহাতে দেশবাসীর এমন যে কি নাড়ীর যোগ আছে, তাহাও আমার বোধশক্তির অগম্য!

আসল কথা এই যে, সমালোচকগণ ভুলিয়া যান—যাহা সাহিত্য তাহা একমাত্র রসের দিক দিয়াই বিচার্য্য। তাহার মধ্যে নীতি উদ্দেশ্য ধর্ম্মপ্রচার প্রভৃতি ঢুকাইতে গেলে, তাহা সাহিত্য না হইয়া অপসাহিত্যই হইয়া পড়ে। যাহা art তাহা চিরদিনই art, তাহাকে art রূপেই দেখিতে হইবে। artএর মধ্যে নীতি প্রভৃতি উদ্দেশ্য গৌণরূপে থাকে—মুখ্যত নহে। কেবল মিষ্ট রসের জন্যই যদি কেহ রসগোল্লা খায়—তবে তাহার বুদ্ধির আমরা তারিফ্ না করিয়া বলি, রসহীন গোল্লায় যাও! নীতিপ্রচারের জন্য রসসাহিত্যের আবিষ্কার হয় নাই।

সেকালের সাহিত্যের আদর্শই ছিল যেন এক কাজে দুই কাজ হয়। ধর্ম্ম অথবা নীতিপ্রচারও হয়, গ্রন্থরচনাও হয়! তখন যে সকলেই বড় ধার্ম্মিক ছিল তাহাও নয়, তবে ধর্ম্মের ভান ছিল অনেকেরই, নহিলে সমাজে তাহাকে ব্যক্তিগতভাবে লাঞ্ছিত হইতে হইত। কাজেই যাহাতে ধর্ম্মের কথা না থাকিত, তাহার প্রকাশ্য আদর সম্ভবপর ছিল না। গ্রন্থকারগণ তাহা জানিতেন। কাজেই গ্রন্থও সেই মত রচিত হইত। সুতরাং কাব্য হিসাবে নিখুঁত বিশেষ কিছুই রচিত হয় নাই। পুরাতন সাহিত্যের পর্ব্বতে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি প্রভৃতি দুই চারি জন ছাড়া, সত্য কথা এই যে, সবই রাবিশ, এবং তাঁহাদের কেহই জীবিত নাই।

গদ্যরচনা সেকালে ছিলই না। কাব্যে যে ধর্ম্ম প্রচার বা নীতিশিক্ষা থাকিবেই না, থাকা পাপ—এ কথা আমি বলি না। তবে ধর্ম্ম বা নীতিশিক্ষাকে মুখ্যাসন না দিয়াও কাব্য রচনা হইতে পারে—এবং আমার বিশ্বাস, আর্টের মাপকাটিতে সেই কাব্যই আসল কাব্য। যাহা সুন্দর মঙ্গল এবং কল্যাণকর—

তাহাই কাব্যের বিষয়। সুতরাং সুন্দর শুভ ও সত্যের ভিতরে দুর্নীতি বা অধর্ম্ম কখনই আসিতে পারে না। হয়ত অনেকে খুব টলিয়া উঠিবেন, তবুও আমার বিশ্বাস, প্রচলিত বহু কৃষ্ণ-পদাবলীতে অথবা সত্যপীরের পাঁচালীতে কিম্বা ঐরূপ অন্য কোনও "সমাদৃত" সেকালী সাহিত্যে (!) কাব্যাংশ মোটেই নাই। তবু যে সেগুলি চলে—তাহার কারণ ইহা নয় যে, লোকের ঐগুলি অত্যন্ত ভাল লাগে। সত্যপীরের পাঁচালা প্রভৃতি হিন্দুর ব্রতে দরকার, এবং শ্রীকৃষ্ণের কথা কি অবজ্ঞা করা যায়? কৃষ্ণে ভক্তির অপেক্ষা, সংস্কারে লোকের ভক্তি যে ঢের বেশী!

দ্বিতীয় কারণ—হিন্দুর দেবদেবীর কথা সকলেই জানে, কাজেই ওগুলি সহজেই বোধগম্য হয়। যাহা বোধগম্য নয়, তাহা যত ভালই হউক, কখনই ভাল লাগে না।

তৃতীয় কারণ—আমাদের জনসাধারণের শিক্ষার অভাব; তদুপরি, শিক্ষিত সমাজের সঙ্গে জনসাধারণের কোনও যোগ নাই। কাজেই নূতন ভাব, নূতন যুগ, নূতন সাহিত্য তাহাদের কাছে অজ্ঞাত, সুতরাং অবোধ্য। ভাব—শুধু শিক্ষায় হয় না, পরস্পরের সম্মিলনেই অধিক পরিমাণে সঞ্চালিত হয়। একটু মনোযোগ করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, সহরবাসী অথবা সহর-ঘেঁষা কুলি মজুর গাড়োয়ান কোচম্যান পর্য্যন্ত নব্য সাহিত্যের গান গায়, হয়ত তাহারা তাহার অর্থও জানে না। কিন্তু অদূর মুর্শিদাবাদের অথবা বর্দ্ধমানের তথাকথিত শিক্ষিত নব্য ভদ্রলোকও বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের কোন ধারই ধারেন না! ইহার কারণ, গানটা শীঘ্র এবং মুখে মুখে চলে বলিয়া। সেকালে এইজন্য সবই গানে রচিত হইত।

গানগুলি যেমন চলিয়া আসিতেছে—তেমন কৈ রামায়ণ মহাভারত অথবা পুরাণ-উপনিষদ চলিয়াছে? তাহা হইলে কি বুঝিব যে, উক্ত রাধাকৃষ্ণের গানে যত কাব্য এবং ধর্ম্মকাহিনী আছে—রামায়ণ পুরাণ উপনিষদাদিতে তাহা নাই? আর যাহা মুখে মুখে চলে, তাহা যে খুব ভাল বলিয়াই চলে—তাহাও সব সময় সত্য নহে।

মুখে মুখে গানই চলে। আর তাহা চলিবার সব চেয়ে বড় কারণ এই যে, তখন এই সব গান লোকের গৃহে নিয়তই গীত হইত। সুরলয়ে যাহা শ্রুত হয়, মনের উপর তাহা স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে। মানুষ আপন মনে অজ্ঞাতসারে তাহা চিন্তা করে। মনের ভিতর গান আপনিই গুঞ্জরিয়া উঠে। এইরূপ গুঞ্জরিত শ্রুতপরম্পরা গানই চলিয়া আসিতেছে। প্রাচীন পদাবলীতে যে নানা পাঠান্তর দৃষ্ট হয়, তাহার কারণও ইহাই। এখনও দেখা যায় যে, অনেকে গ্রামোফোন রেকর্ড হইতে গান শিক্ষা করে। নিম্নশ্রেণীর লোকেরাও সেই সব গান, অথবা থিয়েটারের গান গায়। "আমার মন ভুলাল যে, কোথায় আছে সে"—*গানটি আমি একদা একটা ইতর নারীর ঘরে গীত হইতে শুনিয়াছি! ইহাতে কেহই বিশ্বাস করিবে না যে, উক্ত লোকগুলি ঐ নরকে বসিয়া ধর্ম্মালোচনা করিতেছিলেন!

পক্ষান্তরে, রাত্রি ৯।১০টার সময় কেহ কলিকাতার ছ্যাকড়া-গাড়ীর আস্তাবলের ধার দিয়া চলিলেই শুনিতে পাইবেন, কোচ্‌ম্যান্‌ সহিস্‌গণ তালরস-জারিত কোমল কণ্ঠে গাহিতেছে—"পাগল করেছে তোমার

* গানটি স্বর্গগত কবি ও গায়ক বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়ের রচিত। ইনি লেখকের খুল্ল-পিতামহ।

হাঁখিতে প্রা-ণো—হাঁমা—রিঁ—ই—ই—ই—"। যেহেতু অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর লোক পর্য্যন্ত গানটি গাহিয়া থাকে, সেইজন্য উক্ত গানটি যে বর্ত্তমান সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গান—এ কথা সমালোচকগণ যদি বলেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, লোকালয় তাঁহাদের পক্ষে নিরাপদ হইলেও, লোকের নয়।

ইহা ছাড়া, বাঙ্গলার আশা ভরসা আকাঙ্ক্ষা দেশাত্মবোধ প্রভৃতি অধুনা যেরূপ পরিমার্জ্জিত স্পষ্ট এবং উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছে, অন্য কোনও যুগে সেরূপ হয় নাই। তাঁহারা জড় ত চিনিতেনই না—আধ্যাত্মিকতার জ্ঞানও সাধারণ লোকের ছিল ভাসা-ভাসা। কাজেই তখনকার লোকের ধর্ম্মজ্ঞান অপেক্ষা, ধর্ম্মভানই ছিল সমধিক।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—সে কালের যাহা কিছু সবই কালীতারা অথবা রাধাকৃষ্ণের ব-কলমে রচিত হইত। বোধ হয়, ভারতচন্দ্রই প্রথম রক্তমাংসের সাধারণ নরনারীকে কেন্দ্র করিয়া বাঙ্গলায় কাব্য-রচনায় অগ্রসর হন্। তবু তাঁহার কাব্যমধ্যে অলৌকিক ঘটনা অথবা দেবদেবীর আবির্ভাব অন্তর্দ্ধান আছে। পূর্ব্বকথিত ধর্ম্মভানের প্রভাব তিনিও এড়াইতে সমর্থ হন নাই।

লোকে এখনও তাঁহার অন্নদামঙ্গল অপেক্ষা বিদ্যাসুন্দরেরই অধিক আদর করে। বিদ্যাসুন্দর কাব্য সম্বন্ধে অনেকের অনেক মতদ্বৈধ থাকিতে পারে, আছেও—সে সম্বন্ধে আমি কোনও উল্লেখ করিতেছি না, তাহার স্থানও ইহা নহে। আমার জিজ্ঞাসা, বিদ্যাসুন্দর জনসমাজে যতটা আদৃত—ততটা কি অন্নদামঙ্গল? কেন নয়? আমরা ধর্ম্মপ্রবণ আধ্যাত্মিক জাতি, অন্নদামঙ্গল ফেলিয়া, বিদ্যাসুন্দরের আদর করি কেন?

তবেই দেখা যাইতেছে যে, সেকালের কেবল গানই আজও মুখে মুখে চলে না, ধর্ম্মভাববিহীন অন্যান্য ভাল জিনিসও সেকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। অতএব সেকালের যাহা কিছু সবই আজ পর্য্যন্ত জীবিত নাই। যাহা আছে, তাহা সব তথাকথিত ধর্ম্মভাবপূর্ণ আধ্যাত্মিক রচনাও নয় এবং বাঙ্গালীর আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি গৎ ছাড়া অন্য লেখাও জীবিত আছে, দেখা যাইতেছে।

চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ছাড়া জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি বহু বৈষ্ণব কবির অনেক লেখা আজও চলে—তাহা কৃষ্ণপ্রেমের বলিয়া নহে, তাহা উচ্চ শ্রেণীর কাব্য বলিয়া।

গানের মত কবিতাও মানুষের মনে অনেক দিন থাকে এবং মুখে মুখে চলে। এই জন্য ডাকের কথা, খনার বচন, ব্রতকথা, পাঁচালী প্রভৃতি কবিতায় রচিত হইত। এগুলিকে ওরূপ অদ্ভুতরূপে মোচ্ড়াইয়া মিলাইবার কারণই এই যে, লোকের যাহাতে মনে থাকে এবং লোকমধ্যে শীঘ্র চলে।

তারপর, সে কালের সমাজ আশা আকাঙ্ক্ষা। সমাজ ছিল—চোখঢাকা বলদের ঘানি! আশা ছিল—কেবল বাঁচিবার আর সাত বেটার বাপ অথবা মা হইবার। আর আকাঙ্ক্ষা ছিল—জাতিরক্ষা অর্থাৎ ছুৎমার্গ এবং আচারপালন এবং "অন্তে যেন ঐ চরণ পাই।" ধারণা ছিল—সংসার মিথ্যা—কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ

সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।

জ্ঞানালোচনার মধ্যে জীবনব্যাপী মুগ্ধবোধ এবং পাণিনিপাঠ, নচেৎ কাব্য-পাঠে সেকালে অধিকারই নাকি জন্মিত না! ঘরে অন্নবস্ত্র ছিল—মাথাটা নিয়ত ঠাণ্ডা থাকিত বলিয়াই সারাজীবন উক্ত শাস্ত্রপাঠে ধৈর্য্যও থাকিত।

সংসারের চিন্তা নাই, কন্যাদায় নাই, এরূপ রোগ মারী মহামারী নাই, পুত্রের শিক্ষার ভাবনা নাই, বিদেশ নাই, ট্যাক্স নাই, চাকরী নাই, রাজভয় নাই, বিলাস নাই, খরচ নাই, জাতিভ্রংশ নাই—কিছুই নাই! এই অন্ধ পঙ্গু, মূক, বধির সমাজের মধ্যে কোনও বৈচিত্র্যই তখন ছিল না। সেই থোড়, বড়ি খাড়া এবং খাড়া বড়ি থোড়! কাজেই সেকালের সাহিত্যে আশা আকাঙ্ক্ষার কথা যাহা আছে—তাহা মোক্ষের আকাঙ্ক্ষা। যাঁহার যাহা ইচ্ছা বলুন—আমি বলি, কোনও জাতির আবালবৃদ্ধ সকলের আজীবন সাধনা যদি উক্তরূপ হয়, তাহা হইলে সে জাতি অচিরেই পাথরের মত জড় হইয়া পড়ে। মানুষের চরম লক্ষ্যও উক্ত পদার্থলাভেই পরিসমাপ্ত নহে। মানুষের মোক্ষ ছাড়া আরও অনেক উচ্চতর আশা ও আকাঙ্ক্ষা থাকা উচিত। সংসারে যখন সে আসিয়াছে, তখন তাহার মধুটুকু তাহাকে আহরণ করিতেই হইবে; যদি না করে ত বলিতে হইবে—

"মূর্খ তুমি মাটি কাটি লভি কোহিনূর
সে রত্ন ফেলিয়া হায়
কে ঘরে ফিরিয়া যায়
বিনিময়ে অঙ্গে মাটি মাখিয়া প্রচুর।"

সেকালে মানুষের জীবন যখন বদ্ধ জলাশয়ের জলের মত সংকীর্ণ ছিল, তখন উক্তরূপ বিকৃত বৈরাগ্য সম্ভবপর ছিল। আজ তাহা ভণ্ডামি। কারণ সে দিন আর আজ নাই।

পণ্ডিতেরা বলেন—যে জাতির অতীত গৌরবময় নয়, সে জাতি কখনও উন্নত হয় না। কথাটা ঠিক। আমরা এখন যদি নিষ্ক্রিয় হইয়া তাকিয়া

ঠেস্ দিয়া চক্ষু কর্ণ বন্ধ করিয়া, কেবল সেই অতীত গৌরবের আত্মপ্রসাদেই বিভোর হইয়া থাকি, এবং সেই লুপ্ত গৌরবকে কোম্পানীর কাগজ করিয়া তাহার সুদে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে চাই—তাহা হইলে, তাহার ফল কি হয়, সমালোচকগণ একবার তাহা ভাবিয়া দেখিবেন। এই বিংশ শতাব্দীতে নিজের হাতে সব করিয়া লইতে হয়ঃ পরের পায়ে দাঁড়াইবার দিন এ নয়।

এই বর্ত্তমান সময়, ইহা আমাদের জাতির এবং দেশের পক্ষে এক অভূতপূর্ব্ব নূতন। আমরা এখন জগতের সমস্ত জাতির সম্মুখে দাঁড়াইয়াছি, পৃথিবীর সঙ্গে কার্‌বার ফাঁদিয়াছি, তাহাদের সঙ্গে আত্মরক্ষার জন্য প্রতি-যোগিতা করিতেছি। আগে আমরা "লুপ্ত হয়ে সুপ্ত হয়ে বদ্ধ গৃহকোণে" থাকিতাম, এ সবের খোঁজও রাখিতাম না। জীবনধারণ এবং পরিবারপালন যে একটা আয়াসসাধ্য ব্যাপার বা সমস্যা, তাহাও জানিতাম না। এখন এই সমস্যা নানা জনে নানা আকারে নানা উপায়ে সমাধান করিতে যত্নবান হইয়াছে। এই উৎকট পরীক্ষার দিনে আমরা কোনও বিরোধ, কোনও সংঘর্ষ, কোনও আচার, কোনও শাসনই মানিতেছি না।

বিশ বৎসর পূর্ব্বেও সমুদ্রযাত্রা একটা মহাপাপ ছিল, এখন আর তাহা আছে? এখন কুক্কুটমাংস চলিতেছে, বিলাতফেরৎ চলিতেছে, ছুৎমার্গ উঠিতেছে, জাতিবিরোধ কমিতেছে, উচ্চনীচ বর্ণভেদ দূর হইতেছে, শিক্ষিতের সংখ্যা বাড়িতেছে, এক কার্য্যের জন্যই ব্রাহ্মণ এবং চণ্ডাল গিয়া প্রার্থনা করিতেছে, চারিদিকে ব্যয়বাহুল্য ঘটিতেছে, একই শাসনে আব্রাহ্মণচণ্ডাল শাসিত হইতেছে! ব্রাহ্মণের জন্য যেমন কোনও বিশেষ অনুগ্রহ নাই, চণ্ডালের জন্য তেমনি কোনও বিশেষ শাস্তিও নাই।

সামাজিক আচার-ব্যবহারেও এইজন্য নানা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কন্যার বিবাহের এখন কোনও বয়স নাই—১৭।১৮ বৎসরের অনূঢ়া কন্যা এখন প্রচুর: কুলশীল অপেক্ষা পাত্রই এখন সবিশেষ বাঞ্ছনীয়; কুলীন, এখন কুলে নয়, ধনে ও বিদ্যায়। তাই এখন দেশে অসবর্ণ বা আন্তর্জ্জাতিক বিবাহও চলিতেছে। সুদূর অর্দ্ধশিক্ষিত পল্লী ছাড়া, আর কোথাও সমাজের প্রভুত্ব বড় কেহ স্বীকার করে না! নারীমহল ছাড়া গুরু-পুরোহিতের আর তেমন আদর নাই। নানা উপায়ে পুরাতন সংস্কারের জীর্ণ চুণবালি এখন বাঙ্গলার ঊনপঞ্চাশ মহলা অট্টালিকা হইতে নিয়ত খসিয়া পড়িতেছে। হাজার বছরের পুরাণো সেই চূণবালি কোন্ মূর্খ আবার সেই ফাটা দেওয়ালে বসাইতে পণ্ডশ্রম করিবে এখন?

যে যুগ গিয়াছে তাহাতে বেশীর ভাগ মানুষই ছিল অলস, জড়, অশিক্ষিত, সাধারণ, উদ্দেশ্যহীন, সুতরাং অন্ধসংস্কারের ক্রীতদাস, লোকাচারের অনুগামী এবং ধর্ম্মভানের ভণ্ড। এ যুগ যে আসিয়াছে ইহাতে মানুষ কর্ম্মী, বাতাসের মত চঞ্চল, বিদ্যুদগ্নির মত সচেতন। শিক্ষায়, বিজ্ঞানে এবং উচ্চাশায় এ এক নূতন জাতি। এই নব-অভ্যুদিত বাঙ্গালী জাতি পুরাতনকে ভাঙিয়া, পিটিয়া, গলাইয়া নূতন করিয়া গড়িতে চায়; যুক্তি বিজ্ঞান বিদ্যায় পুরাতনকে নূতনের সঙ্গে কুচ্ করাইতে চায়; জগতের যত কিছু ভাল, সমস্ত আহরণ করিয়া আনিয়া পুরাতনের জীর্ণ-কন্থা ছাড়াইয়া নূতন সাজে জাতিকে সজ্জিত করিতে অভিলাষী।

কাজেই বঙ্গের অভিনব এই সাহিত্য নূতন বটে, কিন্তু অস্বাভাবিক নহে। সাহিত্যও যে জাতির বাহিক ও আন্তরিক পরিবর্ত্তনের দ্রুত পদক্ষেপের সহিত চলিতে পারিয়াছে ও পারিতেছে, ইহা আমাদের জাতীয় শুভ লক্ষণ।

বলিতে পার, বাঙালী আর সে-বাঙালী নাই। বাঙালী নূতন হইয়াছে। এখন তাহার আশা আকাঙ্খা আচার ব্যবহার শিক্ষা ধী মনীষা বুদ্ধি চিন্তা ও দৃষ্টি বিচিত্র হইয়াছে! জগতের সভ্য জাতির সঙ্গে এখন বাঙালী খুঁট মিলাইয়া চলিতে চায়! দুর্দ্ধর্ষ অপ্রমেয় বলীর সঙ্গে দ্বন্দ্বঘোষণা করিতে চায়। জগতের চিন্তাধারার সহিত তাহারও চিন্তাধারা মিশাইতে চায়! জগতের সব ভাল আপনার করিতে চায়। বাঙালী মানুষ, সে মানুষের রাজ্যে মনীষার স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে চায়। কাজেই আজ তাহার সাহিত্যও সহস্রমুখ, বিচিত্র, এবং অভিনব। এ সাহিত্য অজ্ঞ, অশিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত জনসঙ্ঘের এত শীঘ্র সম্যক বোধগম্য হয়ত হইবে না। এই নব-সাহিত্যের সহিত বর্ত্তমান শিক্ষিত বাঙালী জাতির ধাতুর যেরূপ যোগ আছে, সেকালে এরূপ ছিল না। তাই বলিতেছি—তুমি বলিতে পার, বাঙালী আর সে বাঙালী নাই, পরিবর্ত্তিত; কাজেই সাহিত্য ও সাহিত্যের ধারা এবং দৃষ্টিভঙ্গীও পরিবর্ত্তিত। সাহিত্য জাতীয় মনের ছায়া। আজ আমাদের মনও যেমন নানা উচ্চাকাঙ্খায় ভরা, সাহিত্যও সেই সব বিচিত্র আশা-ভরসার সুখদুঃখ-কাহিনীতে লীলায়িত। নাড়ীর যোগ এইখানেই। আজ সাহিত্যের আদর্শও অন্যরূপ। পুরাতন আদর্শ আজ আর বঙ্গসাহিত্যকে চালনা করিতেছে না। পুরাতন ভাব, পুরাতন বিষয়, পুরাতন কথার রোমন্থনও আর নাই। এখন নূতন ভাব নূতন বিষয় নূতন ভঙ্গী।

বিশ্বের দরবারে যে সাহিত্য গিয়া আপনার দর্ভাসন দখল করিয়া লইয়াছে, যে সাহিত্যের বাণী এই বিশ্বের মহামানবের কানে অমৃতধারা বর্ষণ করিতেছে, যে সাহিত্য জগৎকে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছে—

তাহাকে প্রাণহীন, নিঃসার, নকল যে বলে, সে বাতুল। গ্রামের মধুসূদন—গ্রামে চিরদিন ম'ধো হইয়াই থাকিবে, ইহাই 'সেকাল'-প্রিয় বাঙালী সমালোচক মহাশয়গণের আন্তরিক ইচ্ছা। অতীত কালের কাল্পনিক অথবা ছিল-কি-না গৌরব লইয়াই গর্ব্ব করিব, অথচ প্রাণ থাকিতে বর্ত্তমানের প্রশংসা করিতে পারিব না—কারণ, তাহা হইলে কোনও ব্যক্তিবিশেষ বা কোনও সম্প্রদায়-বিশেষকে প্রশংসা করিতে হইবে! এইরূপ সংকার্য্যের সহিতই বুঝি বাঙালী জাতির নাড়ীর যোগ চাই?

যাহাই হউক, বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ বাঙালী জাতির জন্য যে দুই মহাসাহিত্য সৃজন করিয়াছেন, বিংশ শতাব্দীর বাহির ও অন্তরের পরিচয় এই দুইটি খুঁজিলেই পাওয়া যাইবে, অধিক দূর যাইতে হইবে না। বঙ্কিম-রবীন্দ্র-সাহিত্যরূপ দুই মহাদ্রুমে বঙ্গবাণীর যে অপূর্ব্ব তোরণ রচিত হইয়াছে, তাহা অমর, অক্ষয় এবং বঙ্গীয়! শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া যাইবে—আবার কত পরিবর্ত্তন আসিবে—আজিকার এই-সব নূতনও তখন অতি পুরাতন অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িবে, এ দিনের চিহ্নমাত্রও থাকিবে না: তবু, এই অক্ষয় তোরণমূলে দাঁড়াইয়া তখনকার লোকেও বলিবে—এই তোরণ দিয়াই বঙ্গবাণী সেকালে বাঙ্গলায় শুভ পুনঃপ্রবেশ করিয়াছিলেন।

প্রবাসী, মাঘ, ১৩২৫

বাংলা সাহিত্যের অভিব্যক্তি

বঙ্গসাহিত্যের যে স্তরে আমরা এখন উপনীত, তাহা বহু কাল ও ধর্ম্মের উত্থান ও পতন, সংঘাত ও প্রতিঘাত,বাদ ও বিসংবাদেরই পরিণতি। রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে বঙ্গদেশের হিন্দু ও অহিন্দু নরপতিগণের সম্বন্ধে কালে কালে অনেক সত্য অনেক মিথ্যা প্রচলিত হইয়াছে—তাহার মধ্যে হয়ত কিছু ঘটিয়াছিল, কোনোটির বিষয় উক্ত নৃপতিও হয়ত অজ্ঞ, তাহা লইয়া আজ পর্য্যন্ত বহু বাক্‌বিতণ্ডা চলিতেছে, ঐতিহাসিকগণ সত্যনিরূপণে সবিশেষ ব্যস্ত। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ক্রম-বিকাশের যে ইতিহাস আপনা আপনিই লেখা হইয়া আসিতেছে, তাহার জন্য অত বেশী সন্ধান হয়ত বা করিতে হইবে না। কারণ, যাহা মানববিশেষের, তাহার মধ্যে অনেক জল্পনা-কল্পনা ও অসঙ্গতি থাকিতে পারে, কিন্তু যাহা মানব-সাধারণের চিন্তার এবং আভ্যন্তরীণ ঘাত-প্রতিঘাতের ফল, তাহার পরিচয়ে কল্পনার স্থান বড় বেশী থাকে না বলিয়াই মনে হয়।

দেশে, সমাজে এবং মানব-তন্ত্রের মধ্যে জাতীয় জীবনকে সংক্ষুব্ধ করিয়া যখনই যাহা কিছু ঘটিয়াছে, তাহারই প্রতিচ্ছবি অমনি তৎকালীন সাহিত্যে আসিয়া পড়িয়াছে। চিন্তাফলভারাবনম্র জাতির জীবন-বৃক্ষ যেমনি কোনো কারণে চঞ্চল হইয়াছে, অমনি তাহা হইতে শাখাচ্যুত ফলরাশি ভূপৃষ্ঠে ঝরিয়া পড়িয়াছে। এ গাছ যখন প্রবলতর বেগে দুলিয়াছে, তখন তাহা হইতে কিছু অপক্ক ফলও যে

না পড়িয়াছে, তাহাও বলা যায় না। মানব-মনে ফটোগ্রাফের ক্যামেরা বসানই আছে, তাহার সম্মুখে যে কার্য্যই হইয়াছে, তাহারই প্রতিমূর্ত্তি তৎক্ষণাৎ গৃহীত হইয়া, সাহিত্যের negativeএ তাহা পরিব্যক্ত হইয়াছে।

শিল্পকলাসৃষ্টিতে বৌদ্ধ-যুগই এদেশকে প্রথম উদ্বুদ্ধ করে। বৌদ্ধ-যুগে বাংলা ভাষার তেমন কোনো প্রচলন ছিল বলিয়া জানা যায় না, কাজেই সে সাক্ষ্য বাংলা সাহিত্যে বিশেষ নাই-ও। আজকালকার দুই একজন পণ্ডিত যদিও প্রমাণ করিতে চাহিতেছেন যে, বৌদ্ধ-যুগেও বাংলা সাহিত্য-সৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু সে ভাষা যে বাংলা ভাষা, সে বিষয়ে সন্দিহান হইবার যথেষ্ট কারণ আছে! সে যাহাই হউক, বৌদ্ধযুগের অন্তিমকাল হইতেই বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ পরিস্ফুট দেখিতে পাই।

বৌদ্ধ-যুগের শেষে গৌড়ে যে বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্মের প্রবল আধ্যাত্মিক লড়াই বাধিয়াছিল, তাহাই যেন বঙ্গসাহিত্যের ভাগ্য-সূচনা করিয়া দিয়াছে। এই যে বৌদ্ধ-মঠে হিন্দুর মন্দিরপ্রতিষ্ঠা, এক দেবতাকে বিদায় দিয়া অন্য দেবতাকে সংবরণ, এক সম্প্রদায়ের তীর্থে অন্য সম্প্রদায়ের তীর্থরচনা, এই যে ধর্ম্মপরিবর্ত্তনের বিপ্লব, বিদ্রোহ এবং নূতন ও পুরাতনের ঘাত-ঘতিঘাত, ইহার ইতিহাস, সঠিক না পাওয়া গেলেও, পরিবারমধ্যে কোনো শুভাশুভ ঘটনা ঘটিলে, বাড়ীর লোকের মুখ দেখিলেই যেমন সাধারণত সে ঘটনার কতকটা আভাস পাওয়া যায়, তেমনি তৎকালীন বঙ্গসাহিত্যে সে বিপ্লবের আভাষ যথেষ্টই আছে।

স্মরণাতীত কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত, ভারতবর্ষে আর্য্য অনার্য্য শক হুন্ হইতে আরম্ভ করিয়া কত কত জাতির ধর্ম্মের এবং সম্প্রদায়ের

অভ্যুত্থান ও পতন সংঘটিত হইল, কিন্তু এত বিরোধ এবং বিপ্লবের মধ্যে কোথাও তিক্ততা বা কোনও অসামঞ্জস্য নাই। আর্য্যেরা অপূর্ব্ব নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভাপ্রাখর্য্যে, এই অন্তহীন পারস্পরিক উচ্ছেদ-উদ্যমকে এক নিবিড় শান্তি এবং সমন্বয়ের সাম্যে, আপনাদিগের উদার মতের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া, মিলাইয়া, মিশাইয়া, এক করিয়া, সসম্মানে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। নিপুণ পাচকের গুণে, এই সব নিম-উচ্ছে-করলাও অপূর্ব্ব মুখরোচক ব্যঞ্জনরূপে আজ পর্য্যন্ত পরিবেশিত হইতেছে।

এই যে দ্বন্দ্ব, ইহার মূল কারণ দেবদেবীর পূজা-প্রতিষ্ঠা লইয়া। এক সম্প্রদায় আসিলেন, তাঁহাদের মনোনীত কোনো এক বিশেষ দেব-দেবীর পূজা-প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য! অন্যদল প্রচলিত ধর্ম্মমতের খাস-জমিতে নূতনকে ইঁট গাড়িতে দিবেন না বলিয়া অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইলেন। এই যে বিরুদ্ধাচরণ, ইহা শারীর বলে বা অসির দ্বারা হয় নাই, বিদ্যার বলে এবং মসীর সাহায্যে হইয়াছে। উভয় দলের যত বিবাদ, সব নিজ নিজ দেবদেবীর শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনে। বৈদিকযুগে এইরূপে একে একে সূর্য্য চন্দ্র বায়ু বরুণ প্রভৃতি বৈদিক দেবতাদিগের পূজা প্রচলিত হইয়াছিল। তাহার পর শিবপূজা চলিল। তাহার পর মাতৃকা-পূজা—চণ্ডী কালী দুর্গা প্রভৃতি নারীশক্তি বা প্রকৃতিপূজার যুগ আসিল। ভাস্কর্য্যে, স্থাপত্যে, কাব্যে, গানে, সাহিত্যে যে সম্প্রদায় যত নিপুণ ছিল, তাহাদের প্রবর্ত্তিত মতও তত শীঘ্র জয়ী হইয়া, তত বেশী স্থায়ীও হইয়াছে। এই যে নিয়ত ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তন, ইহার কারণ আর কিছুই নয়—কেবল নূতন সম্প্রদায়ের জয়লাভ। এই যে অনবরত বৈচিত্র্যময় ধর্ম্ম-বিপ্লব, ইহার কোনটিই কিন্তু স্বাধীনভাবে স্থায়িত্বলাভ করিতে পারে নাই।

সব গুলিই হিন্দুধর্ম্মের বিপুল অতিথিশালায় আসিয়া সকলের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করিয়া, চিরদিনের মত বসবাস জুড়িয়া দিয়াছে। প্রথম দিন যখন ইহারা তৎকালিক ধর্ম্মমতের স্থির সিংহাসন প্রকম্পিত করিয়া, উন্মত্ত জিগীষায় বিপ্লবের রক্ত-নিশান উড়াইয়া, রাজ্যের নগরপ্রান্তে মহা-কোলাহলে আসিয়া উপনীত হইয়াছিল, তখন হয়ত হিন্দু ধর্ম্ম-মতের বিরাট দিগ্‌বারণ চকিত হইয়া দুই একবার শুণ্ড আস্ফালন করিয়াছিল; কিন্তু আর্য্য সেনাপতিগণ আধ্যাত্মিক রণচাতুর্য্যের ফাল্গুনী ছিলেন, নবাগতকে সাদর স্বাগত জানাইলেন। অতিথিও ক্রমশ বৈরভাব বিস্মৃত হইয়া, আজও তাঁহার চরণে ভক্তি-করদান করিয়া ধন্য হইতেছে।

বেদ আর্য্যদিগের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল সত্য, কিন্তু সাহিত্যরচনা করে নাই। পরবর্ত্তী বেদান্ত তাহা করিয়াছিল। কিন্তু বেদান্তের ধর্ম্মমতে জনসাধারণ সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। উৎসবহীন জ্ঞানমূলক মায়াতীত শান্ত মতবাদ লোকের মনকে তেমন নাড়া দিল না বলিয়া, কেহ তেমন আদরও করিল না। তাহারা উৎসব চায়, ঐশ্বর্য্য চায়, আনন্দ চায়—কাজেই উৎসবের জন্য অন্য মতের প্রয়োজন হইল। চণ্ডী আসিলেন। বৈদান্তিক নিষ্ক্রিয়তার স্থানে, উগ্রচণ্ডা শক্তিমাতৃকার অভিষেক হইল। যাহার যাহা নাই বা ছিল না, সে হঠাৎ তাহা পাইলে প্রথমটা তাহার সুব্যবহার করিতে পারে না: চিরদরিদ্র হঠাৎ ধনশালী হইয়া উঠিলে, হয় সে সেই ধন যক্ষের মত পুঁজি করে, নয়, দুই দিনে উড়াইয়া দিয়া পুনর্মূষিক হয়—প্রকৃত ভোগে লাগাইতে পারে না।

চণ্ডীপূজার আবির্ভাবে দেশবাসিগণের হৃদয় আনন্দে উল্লাসে ও উৎসাহে চঞ্চল হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু জনসাধারণের সম্মুখে

চণ্ডীর শক্তিটি সু-অভিব্যক্ত হইল না। চণ্ডী শক্তীশ্বরী হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার শক্তি প্রসাদ-ঐশ্বর্য্যময়ী হইল না, লোকের প্রীতি অপেক্ষা ভীতিকেই সমধিক জাগাইয়া তুলিল। চণ্ডীর মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব পরি-কীর্ত্তনে দিকে দিকে নব নব গীত ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। অনেক দিনের নিরুৎসব মনে আনন্দসমারোহের উৎসব জাগিয়া উঠিল।

নূতনের মাদকতা চিরদিনই আছে, তখনও ছিল। পুরাতন পূজা-পদ্ধতি, যাহা ক্রমে ক্রমে সমস্তই বিরাট হিন্দুধর্ম্মের বিপুল দেউলে পরগাছা হইয়া গিয়াছিল, তাহাদের প্রতি লোকের আর তেমন আস্থা রহিল না। প্রথম যখন শিবপূজা চলিয়াছিল, তখন শিবের মধ্যে চণ্ডতা উগ্রতা ও একটা প্রবল সংহারশক্তি ছিল! কিছুদিন পরে ক্লান্তের মত, সেই প্রচণ্ড দেবতাটি যোগ-সমাহিত শ্মশানের দেবতারূপে নির্গুণ স্থির ও নিশ্চল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার দেহ হইতে সে দিন যে শক্তি আপনাআপনি ঝরিয়া পড়িয়াছিল, ক্রমশ তাহা স্বতন্ত্র শক্তিরূপে আবির্ভূত হইল। শক্তি ও শক্তীশ্বরী দুইটী পৃথক সত্তায় বিরাজ করিতে লাগিলেন।

এই যে শক্তির প্রতিষ্ঠা হইল, ইহাতে ন্যায় ধর্ম্ম বিচার নীতি প্রভৃতি স্থিরধীত্বের কোনও লক্ষণই পরিলক্ষিত হইল না। এ যেন ঝঞ্ঝা, অগ্ন্যুৎপাত, ভূকম্প—শক্তির একটা যথেচ্ছাচার, বিচার-বুদ্ধিহীন প্রচণ্ড শক্তিই! নৈসর্গিক উৎপাতে দেশে যেমন এক এক জাতির ধ্বংসের উপর জাত্যন্তরের অভ্যুদয় কখনো কখনো সম্ভব হয়, তেমনি চণ্ডীর শক্তিও একটা প্রলয়শক্তির মত প্রচণ্ড ধ্বংসলীলায়, বহু দিনের নিশ্চেষ্ট বৈদান্তিক অলস তন্দ্রার উপর, একটা কর্ম্মোদ্যমের জাগরণ আনিয়া দিয়াছিল। সদ্যনিদ্রোত্থিতের মত বিমূঢ়াবস্থায় তাহারা তখন ভাবিবার

চিন্তিবার কোনো অবসর পায় নাই! যাহা পাইয়াছিল অসন্দিগ্ধচিত্তে যদিও তখন লইয়াছিল, শেষ পর্য্যন্ত তাহা কিন্তু রক্ষা করে নাই।

বঙ্গদেশে এই যে নারীশক্তির চণ্ডলীলা প্রবর্ত্তিত হইল, ইহাই বাঙ্গলা-সাহিত্যের গতিতে একটি নূতন বেগসঞ্চার করিয়া দিল। বাঙ্গলা দেশের এই যদৃচ্ছাচারিণী ধ্বংসলীলাবিলাসিনী খরকরবালধারিণী চণ্ডী অনতিবিলম্বেই স্নেহ বাৎসল্য ও মাধুর্য্যের অমৃতময়ী সৃষ্টি-স্থিতি-কুশলা সর্ব্বমঙ্গলা মাতৃমূর্ত্তিতে রূপান্তরিত হইলেন। চণ্ডী—অন্নপূর্ণা, রাজরাজেশ্বরী, সিদ্ধেশ্বরী, উমা, লক্ষ্মী, প্রভৃতিতে শতধা বিভক্ত হইলেন। এই মঙ্গলময়ী চিরমাধুর্য্যময়ী দেবীকল্পনাগুলি এ দেশবাসীর মনে-মনে ভবনে-ভবনে অচল আসন স্থাপন করিল। পুরাণ, চণ্ডী, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থে এবং এত দিনের বিভীষিকা-স্তম্ভিত মূক কবিকণ্ঠে শতেক ছন্দে শতেক তান-লয়ে মাতৃমহিমাকীর্ত্তন ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাঙ্গলা সাহিত্য অনেক দিনের অনেক ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে বর্ত্তমানরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, বৌদ্ধ-যুগের শেষ-শয্যায় শৈবধর্ম্ম যখন আপন অধিকারের দাবী জানাইতেছিল, তখন বাঙ্গলা সাহিত্যের গতি এক দিকে ছিল। তাহার পর, এক উদাসীন নিশ্চেষ্ট বৈদান্তিক যুগ। তৎপরে,সেই বিরাট নিশ্চেষ্টতাকে আহত করিয়া জাতির জাগরণকে উদ্বুদ্ধ করিতে শক্তিপূজার কাল আসিল। কিন্তু এমন মৃত্যুতাণ্ডব-প্রিয়া উচ্ছৃঙ্খল শক্তির পূজাতেও বাঙ্গলাদেশ অতি দ্রুত অবসন্ন হইয়া পড়িল, তখন আসিল মঙ্গলময় মাতৃপূজার শুভ লগ্ন। বাঙ্গলার সাহিত্য আপনার গতি আপনি দেখিতে পাইয়া, স্বাধীন ভাবে সুপথে চলিতে আরম্ভ করিল।

দেশে যখন বহুদেববাদ প্রচলিত ছিল, লোকের মন তখন তাহাদের মধ্যে কোনো একটিতে আকৃষ্ট হইয়া অনাহত বৈচিত্র্যহীন অবস্থায় তাহাতেই আমরণ লাগিয়া থাকিত। তদ্দারা লোকের কল্পনা এবং মননশক্তি তেমন উদ্‌বুদ্ধ হইত না। লোকের মন প্রথম সজাগ হইয়া সাড়া দিল, যেদিন ডমরুনিনাদে দেশে পিশাচপতি ভূতনাথের আগমনীগানে, ঢাকে কাঠি পড়িল। প্রথম শৈবধর্ম্ম লোককে অভিভূত করিয়া তুলিয়াছিল। এই নূতনত্বের প্রেরণা কিন্তু স্থায়ী হইল না, শীঘ্রই তাহা আবার তেমনি অবসন্নও করিয়া দিল। মদ্যপান করিবামাত্রই শিরাউপশিরায় দ্রুত রক্ত-সঞ্চালনে মন যত জোরে উত্তেজিত হয়, নেশা কাটিবার সময় তেমনি জোরেই আবার সে অবসন্ন হয়। লোকে বহু দেববাদের শুষ্ক একঘেয়ে জীবনাতিবাহের মধ্যে নবীন শৈবধর্ম্মকে প্রথমে সোৎসাহেই বরণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু বেশী দিন রাখিতে পারিল না—বৈদান্তিক অদ্বৈত-বাদের অবসাদ আসিয়া ঘিরিল। কাজেই মনকে ঠেলা দিয়া, গুঁতা মারিয়া উঠাইবার মত, প্রচণ্ডতর কিছুর জন্য শক্তিপূজার প্রয়োজন হইয়াছিল।

উত্তরোত্তর এইরূপ মাত্রা চড়াইয়া উত্তেজিত হওয়ার পরিণাম যে অকালমৃত্যু, তাহা বুঝিতে পারিয়া, লোকে তখন উত্তেজনার জন্য একটা স্থায়ী আনন্দের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। হাতের গোড়ায় নারীশক্তি ছিল, তাহার হস্ত হইতে ধ্বংসের শাণিত কৃপাণ অপসারণ করিয়া, তাঁহাকে মাতৃমূর্ত্তির বরাভয় দিয়া দেখিল, যে এতদিনে তাহারা সত্য সত্যই এক সুন্দর এবং মঙ্গল রূপ আবিষ্কার করিয়াছে : চারিদিকে কোঠি কণ্ঠে গীতে সঙ্গীতে ও কাব্যে তাহাদের আনন্দ-কোলাহল ধ্বনিয়া উঠিল। সাহিত্যের

পাত্রে সেই আনন্দ-সঙ্গীত নিত্যরসের উৎসধারায় মহামহোৎসবকে ছড়াইয়া গড়াইয়া উপচিয়া পড়িল।

শিবশক্তির ভীষণতায়, বৈদান্তিকের শুষ্কতায়, ভয়াল উষর মরুর উপর স্নিগ্ধসজল বর্ষা নামিল বটে, কিন্তু তাহাও ক্ষণিক এবং অসম্পূর্ণ, যদিও সেই বর্ষার ধারাভিঘাতে অদূর মরুপারের ক্ষেত্রগুলি সামান্য একটু সরস হইয়াছিল মাত্র। ইংরাজেরা ভোজনের আগে একটু ক্ষুধাবর্দ্ধক (appetiser) খায়, যাহা কেবল ক্ষুধার উদ্রেকই করে, উপশম করে না! এই মাতৃপূজাও লোকের তেমনি ক্ষুধার প্রবলতাই বাড়াইয়াছিল, নিবৃত্ত করে নাই। এতদিনকার পীড়িত মনে কেবল দুষ্ট ক্ষুধারই যে সম্ভব হইতেছিল, এক্ষণে স্বাস্থ্যপূর্ণ সবল মনে তাহার স্বাভাবিক ক্ষুধাই জাগিয়া উঠিল। শক্তিপূজায় সাহিত্যেও আমরা একটা নূতন দেশের সন্ধান পাইয়া এমন এক পথসন্ধিতে গিয়া পৌঁছিলাম, যে-খান হইতে ফিরিতে আর ইচ্ছা হয় না, অথচ আগাইবারও পথ ছিল না। মাতৃপূজার যুগে আমাদের মনের অবস্থা ছিল, যেন আমরা এক হইতে অন্য স্তরে যাইতেছি। জ্ঞানের এই মাৎসর্য্য শক্তির নিকট রাজকর দিয়া আমাদিগকে তাহার চিরদিনকার গোলাম করিয়া ফেলিয়াছে। শক্তির পূজা করিয়া—অর্থাৎ শক্তিকে ভয় করিয়া, শক্তি অর্জ্জন করিবার অনিচ্ছা জন্মিল এবং শক্তির ঐ ঐশ্বর্য্যেও কাহারও লোভ জন্মিল না। শক্তি টিঁকিয়াছিল শুধু লোকভয়ে, এবং অকারণ অনিষ্টপাতের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য; যেমন আজ পর্য্যন্ত শীতলা, ওলাইচণ্ডী, মনসা প্রভৃতি অপদেবতাদিগের পূজা প্রচলিত! শক্তিকে বড় করিয়া এবং সভয়ে

দেখিবারদরুণ, শক্তি সকলের ধারণার বাহিরেই রহিয়া গেল। মানবের বিস্ময়াবিষ্ট আনন্দ, নিজের মধ্যেই ক্রমশ শুকাইয়া যাইতে লাগিল।

ঠিক এই সময়ে অর্থাৎ যে সময়ে বাঙ্গলা দেশের হৃদয়মনে একটা প্রবল আবেগ, অথচ দেহ অবসন্নপ্রায়, ঠিক সেই সময়ে বৈষ্ণবের অমৃত নিস্যন্দিনী সঞ্জীবনী সুধা শ্রাবণধারায় বাঙ্গলার কাননে কান্তারে নগরে প্রান্তরে বহিরন্তরে নামিয়া, দেশের পথ ঘাট বাট সব পরিপ্লাবিত করিয়া দিল। বাঙ্গলার নরনারী দেখিল যে, এতদিন তাহারা যেন ইহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল। বৈষ্ণবধর্ম্ম চিরন্তন নরনারীর হৃদয়ের গোপন দুয়ারটি খুলিয়া দিল। মানব দেখিল—তাহার অন্তরে কুবেরের কোষ, অলকার ঐশ্বর্য্য, জগতের স্থাবর জঙ্গম, সকলি সেখানে প্রচুর। তাহাদের মনের সমস্ত অকর্ম্মণ্য বাতায়নগুলি দক্ষিণাগত বাতাভিঘাতে হঠাৎ খুলিয়া গিয়া, নব বসন্তের চূত-মুকুল-সৌরভে ভরিয়া উঠিল। যে শ্যামশোভা জীবনারম্ভ হইতে অবলোকন করিয়া নয়নযুগল বিশেষ কোনো আনন্দ না পাইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সে বিপুল শ্যামশোভান্বিত ধরণীবক্ষ হইতে আজ আর চক্ষু ফিরাইতে পারিল না। আজ যেন তৃণ-তরুলতায় পল্লব-দল-কিশলয়ে এবং বিহ্বল হৃদয়ে একটা অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য জাগিয়া উঠিয়াছে— যাহা চির-তরুণ, চির-মোহন, চিরন্তন। হাজার কণ্ঠে মানবের নিত্যসত্য শুভসুন্দর, উজ্জ্বল গীতি ধ্বনিয়া উঠিল। মাতৃপূজায় যাহা পৃথক সত্তায় ছিল, বৈষ্ণব-যুগে তাহা এক হইয়া নিবিড় হইয়া গেল। এতদিন প্রাণে যে ভাব ছিল, এবার তাহা মনে আসিল, যাহা দেহে ছিল, তাহা হৃদয়ে পৌঁছিল, যাহা দূরে ছিল, তাহা নিতান্ত নিকটে আসিল। জ্ঞান বিচার ও বুদ্ধি যে

ভাবকে এতদিন চাপিয়া রাখিয়াছিল, প্রেম তাহা উৎসারিত করিয়া দিল, জ্ঞান যাহাকে ভুলাইয়া রাখিয়াছিল, প্রেম তাহাকে জাগাইয়া দিল।

শত শত কবির কাব্যে, গায়কের গানে, ভক্তের আত্মনিবেদনে—বাঙ্গলা সাহিত্যের গতি অগাধ অকূল রূপ-সমুদ্রে পাড়ি দিল। অব্যাহত গতিতে বাঙ্গলার সাহিত্য ছুটিয়া চলিল, কোনো বাধাই মানিল না। সুরতরঙ্গিনী যখন ব্যোমপথ বিদীর্ণ করিয়া কোটি কোটি আকুল নরনারীর কাতর আহ্বানে ব্যথিত হইয়া এই শুষ্ক মেদিনীর তপ্ত বক্ষো-পঞ্জরের উপর পতিতপাবন ধারায় উচ্ছ্বসিত আবেগে আসিয়া পড়িয়াছিলেন, তখন ত্রিদিবনাথের ঐরাবতও সে বেগ ব্যাহত করিতে পারে নাই। বৈষ্ণব-যুগের নব সাহিত্যও প্রচুর রসৈশ্বর্য্যে চিরন্তন নরনারীর সুখ-দুঃখ-কাহিনীর অনাবিষ্কৃত মহাসিন্ধুতে আসিয়া অবাধে আত্মসমর্পণ করিল।

যুগগুরুগণের অবর্ত্তমানে তাঁহাদের শিষ্যেরা যেমন তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত সহজ বিধিবিধানগুলিকে নানারূপ কূট টীকাভাষ্যে এবং আধ্যাত্মিক অর্থে রহস্যসমাচ্ছন্ন করিয়া দিয়া, নিজেদের উদরান্নের উপায়ান্তররূপে অবলম্বন করিয়া, জনসাধারণকে প্রতারিত করে, তদ্রূপ প্রথম বৈষ্ণব-যুগের কাব্য-গীতিকায় যে সার্ব্বজনীন মঙ্গল ও সুন্দর সুর বাজিয়া উঠিয়াছিল, পরবর্ত্তী যুগে তাহা ব্যক্তিগত কামবিলাস-কাহিনীর কুরুচিতে একেবারে সংকীর্ণ হইয়া পড়িল। আজিও অনেক ধনুর্দ্ধর সমালোচক সেইগুলিতে আধ্যাত্মিক অর্থ বসাইয়া, পূর্ব্বকথিত শিষ্যদের মত সাহিত্যচর্চ্চার উপায়-রূপে গ্রহণ করেন এবং সেইগুলিকে প্রথম শ্রেণীর কাব্য বলিয়া বুঝাইতে বৃথা প্রয়াস করেন।

সেই সব সমালোচক-ঋক্ষগণ জানেন না, বা মানেন না যে,

সাহিত্যের সৌন্দর্য্য কোথায়। যে কখনও আম্রফল ভক্ষণ করে নাই, তাহাকে আম্রের স্বরূপ বোঝানো যেমন অসাধ্য—তেমনি যে সব তথা কথিত সাহিত্যিকের সাহিত্যের স্বরূপজ্ঞান নাই, তাঁহাদের মাথায় সেই জ্ঞান দেওয়াও তেমনি অসম্ভব: মাছধরা জালে ময়দা চালা অসম্ভব।

কিছুদিন আগে আমি কোনো একটি প্রবন্ধে * বৈষ্ণব সাহিত্যের পরবর্ত্তী যুগে যে কৃত্রিমতা আসিয়াছিল—যাহা সাহিত্য-সৌন্দর্য্যের পরিপন্থী, এই কথাটি বলিবার উপক্রম করিবামাত্রই চতুর্দ্দিক হইতে যে অমানুষিক কিচিমিচি উঠিয়াছিল, তাহার গোলমালে আমি আমার সে বক্তব্যটাকে চাপা দিতে বাধ্য হইয়াছিলাম; কারণ, তাঁহাদের যুক্তি শুনিয়া কিছু জ্ঞান লাভ করিব—এই আশায়; কিন্তু সেই সব আলোচনাতে "আলো"র অংশ এতই কম ছিল যে, শেষোক্ত পদার্থঘটিত পিচ্ছিলতায় অতি-কষ্টে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। আজ এই সুযোগে, সুযোগ্য পণ্ডিতসংসদে বৈষ্ণব সাহিত্যের সেই অসমাপ্ত কথাটিও সংক্ষেপে একটু বলিব। বোধ হয়, তাহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

সাহিত্যের গতি সাহিত্যের নিজস্ব শক্তির উপর নির্ভর করে। সাহিত্য কেবলমাত্র আমাদের দেশেই নহে, সর্ব্বদেশেই নানা বাধা-বিপত্তি পতন-অভ্যুত্থান প্রভৃতির দুরারোহ গিরিবর্ত্ম ভেদ করিয়া, তবে আত্মপ্রকাশ করে। মানুষ গায়ের জোরে অন্তরায় অপসৃত করিয়া চলে, সাহিত্য কিন্তু ঠিক গায়ের জোরে চলে না। তাহার আত্মিক একটা জোর আছে। সে জোরটা কোনো ধর্ম্মমত নয়, কোনো তত্ত্ব নয়, কোনো জটিল রহস্য নয়,

* "নূতন বনাম পুরাতন বঙ্গ সাহিত্য"—প্রবাসী, ১৩২৫।মাঘ

কোনো উচ্চ শ্রেণীর জ্ঞানের কথাও নয়, নিতান্ত সহজ সরল একটা বস্তু, পণ্ডিতগণ যাহাকে বলেন, রস !

কথাটা আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। নৈসর্গিক সৃষ্টি-লীলাতেও আমরা দেখিতে পাই যে, আকর্ষণে বিকর্ষণে, সংযোগে বিয়োগে, সৃষ্টির কার্য্য অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল চলিতেছে। আমাদের মনের মধ্যে যে জগৎ আছে, তাহা ভাবের জগৎ। এই ভাবের দেশেও সেই একই নিয়মে যে বিচিত্র সৃষ্টি চলিতেছে—তাহাই সাহিত্য। তবে বাহিরের সহিত অন্তর্জগতের প্রভেদ এই যে, বহিঃসৃষ্টি নশ্বর, তাহা ঋতুতে ঋতুতে, যুগে যুগে, কালে কালে, পরিবর্ত্তনশীল, আর অন্তরের সাহিত্য-সৃষ্টি চিরকালের, তাই সে চিরকালের নরনারীর অন্তরের বস্তু হইয়াই থাকিয়া যায়। প্রকৃত সাহিত্য অমর। মানুষের মন বাহিরের সমস্ত অবস্থা, কাল ও পাত্র হইতে মধু আহরণ করিয়া অন্তরে বসিয়া তাহার সাহিত্যমধুচক্র নির্ম্মাণ করে। এই জন্য মনের জগৎ বাহিরের জগতের সঙ্গে নিত্যযুক্ত। বহির্জগৎ পরিত্যাগ করিলে মনের জগতের কোনো অস্তিত্বই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ময়রা যেমন সবেদা, শর্করা, ঘৃত, ছানা প্রভৃতি মাল-মশলা লইয়া রসগোল্লা তৈরি করে, অথচ রসগোল্লার মধ্যে সর্ব্বসমন্বয়ে উপরি-উক্ত উপাদান হইতে পৃথক্ একটা আস্বাদ জন্মে, কোনো একটিরও প্রাধান্য বা পৃথক্ সত্তার অনুভূতি হয় না, সেইরূপ মনও বাহিরের সমস্ত উপাদান লইয়াই সাহিত্য সৃষ্টি করে, অথচ তাহাতে বাহিরের কোনো পদার্থেরই প্রাধান্য থাকে না—সকল উপাদানের সংমিশ্রণে মনের কলা-নৈপুণ্যের গুণে—সে এক অনির্ব্বচনীয় রূপ ধারণ করে। এই যে সৃষ্টি, ইহাতে সাহিত্যকার

সর্ব্বকালের সর্ব্বমানবের মনের মাধুরী মিশাইয়া, ইহাকে সার্ব্বজনীন এবং অমর করিয়া তুলেন।

ময়রা সন্দেশে যেমন নানাবিধ আকার দিয়া, বর্ণ দিয়া, নাম দিয়া, জনসাধারণের সমক্ষে বাহির করে, তেমনি সাহিত্যেও নানা ছন্দ, রূপক, অলঙ্কার, উপমা, কলা ও সংজ্ঞার আশ্রয় লইতে হয়। এ গুলিরও বিশেষভাবে প্রয়োজন আছে। কেহ হয়ত বলিতে পারেন—সাহিত্যসৃষ্টি তাহা হইলে কৃত্রিম। ইহার উত্তরে এই মাত্র বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে—সৃষ্টির ইচ্ছা স্বাভাবিক এবং সহজ। এই ইচ্ছা কৃত্রিম নয়। উদ্ভিজ্জ পত্র-পুষ্প-ফলে-বীজে আপনার জাতি সৃষ্টি করিতেছে, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ হইতে মানব পর্য্যন্ত স্বাভাবিক নিয়মেই আপনার জাতি সৃষ্টি করিতেছে! সৃষ্টিটা নিতান্তই অনিচ্ছাকৃত এবং স্রষ্টার অজ্ঞাতসারেই ঘটিয়া থাকে। প্রকৃতির কঠোর বিধান অমান্য করিবার ক্ষমতা যেমন স্থাবর-জঙ্গমে নাই, তেমনি ভাবের জগতেও নাই। বন্ধ্যা নরনারী যেমন হাজার ইচ্ছা করিলেও সন্তান লাভ করিতে পারে না, তেমনি বন্ধ্যা সাহিত্য-সৃজনেচ্ছা মাথা কুটিয়া মরিলেও সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারে না। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই অহরহ ভাবের জন্মমৃত্যুর লীলা চলিতেছে। যাঁহারা সজাগ এবং ভাবুক—তাঁহারা কবি এবং সাহিত্য-স্রষ্টা অভিধা লাভ করিয়াছেন: তাঁহারা আপনার নবজাত ভাবগুলিকে রক্ষা করেন; আর যাঁহারা শক্তিহীন, তাঁহারা আপনার ভাবগুলির ভ্রূণহত্যা করেন। রক্ষা করুন্ আর না-ই করুন্, তাহাতে ভাবের জন্মের কোনো ক্ষয় বৃদ্ধি হয় না।

আর একটি কথা এই যে, মানবের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য-প্রিয়তাই, আদিম উলঙ্গ শিশুকে একটু মাজিয়া ঘসিয়া ধুইয়া সাজাইয়া বাহির করিবার সহজ প্রবৃত্তি দিয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহাতে আসল জিনিষের কোনো তারতম্য ঘটে না, কেবল বাহিরেরই চাকচিক্য একটু বাড়ে মাত্র। দেখিতে ভাল লাগে, তাহাতে দোষ কি? এই সজ্জাই সাহিত্যের অলঙ্কার। বাটীর বাহির হইতে হইলেই, কিছু না কিছু একটু বেশ পরিবর্ত্তন করিতেই হয় যেমন, তেমনি যে ভাব নিজ বাটীর বাহিরে আসিবে, তাহার একটা পোষাক সেজন্য অবশ্যই দরকার।

মানব যেমন মানবের কাছেই আদৃত, মনোভব ভাবও তেমনি মনের কাছেই চিরদিন গতায়তি করে এবং ভাবের সঙ্গেই তাহার একমাত্র কুটুম্বিতা। মানুষ যেমন বিপুল মানব-সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে, বড় হইতে, উন্নত হইতে সর্ব্বদা সচেষ্ট, ভাবও তেমনি ভাবের সমাজে বড় হইতে চেষ্টা করে, মন বহুর মধ্যে বিচরণ করিতে ব্যস্ত হয়, এবং চিরদিন মনের রাজ্যে ভাব-সমাজে একাধিপত্য বিস্তার করিয়া অমর হইতে যত্নবান্। মানবমনের এই যে চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা ইহাই সাহিত্য চিত্র ও সঙ্গীতে আবহমানকাল বংশপরম্পরা নব নব বল সঞ্চার করিয়া আজ আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে! আদি কবির বা সাহিত্যকারের ভাব অমরতা লাভ করিয়া, ভাবের ধারা এবং গতি ঠিক বজায় রাখিয়াছে। তাঁহাদের সেই ভাবের আলবালে আমরা আজিও, জলসিঞ্চন' করিতেছি। কেন? না, সে যে আমারই একান্ত নিজস্ব। সে যে আমার নিজের সুখের শিহরণ, পুলকের রোমাঞ্চ, দুঃখের অশ্রুধারা, বিয়োগের মর্ম্মভেদী শল্য, আশার সুখ-স্বপ্ন, নৈরাশ্যের

তপ্ত মরু, ভয়ের হৃৎকম্প, ভাবনার অকূল পাথার, বেদনার বিষঘাতনা, ভরসার ইঙ্গিত। পঞ্চবটীবনে অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের ব্যথাকে আমরা নিজের মনে করিয়া অশ্রুবর্ষণ করি, অন্যায়প্রপীড়িত পাণ্ডুপুত্র-পঞ্চের জন্য সহানুভূতিতে আমাদের হৃদয় ভরিয়া উঠে, অপর্ণা তপস্বিনী উমার কৃচ্ছ্রতপঃসাধনে আমাদের আদর্শ গড়ি, কান্তা-বিরহ-বিধুর প্রবাসী যক্ষের ব্যাকুলতায় আমাদের সমগ্র মনপ্রাণ অপূর্ব্ব বেদনায় ব্যথিয়া উঠে। এই যে অতিনিবিড় একটি প্রাণের যোগ—ইহা দেশকাল পাত্রের ব্যবধান মানে না। ইহা চিরন্তন মানবের নিজস্ব।

তবেই দেখা যাইতেছে, সাহিত্যের গতি কেবল মনের পথেই! যে সাহিত্যকে যত বেশীক্ষণ মনের মধ্যে ধরিয়া রাখা যায়, সে সাহিত্য তত বেশী বলবান্ এবং সজীব। অনেক রচনা আমাদের মনে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না: সে যেন তৈলহীন দীপের মত, একটু জ্বলিয়াই তৎক্ষণাৎ নিভিয়া যায়; আর তাহাকে হাজার চেষ্টা করিয়াও জ্বালাইতে পারা যায় না। তাহার কারণ, তাহা পথে আসিতে আসিতে আর তৈল পায় নাই, লোকে আদর করিয়া দেয় নাই। যিনি পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহারি দেওয়া তৈলটুকু ফুরাইয়া গেল, আর দীপও নিভিল। এই যে রচনা, বুঝিতে হইবে ইহাতে বহুমনের উপভোগ্য প্রাচুর্য্য ছিল না; ইহা নিতান্তই দরিদ্র; ইহাও সাহিত্যপদবাচ্য হইতে পারে, কিন্তু ক্ষণিক, যেমন জৈব নিয়মে অল্পায়ু সন্তান জন্মে! আর এক প্রকার রচনা আছে, যাহা নিজে ত ঐশ্বর্য্যশালী বটেই, তাহা ছাড়া, যাহাদের বাড়ী ঘুরিয়া আসিতেছে, তাহারাই নিজের ঐশ্বর্য্যে তাহার ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া দিতেছে। ইহাই হইল

আসল সাহিত্য। দীর্ঘজীবী মানুষ যেমন বিরল, দীর্ঘজীবী সাহিত্যও তেমনি একই নিয়মে এত কম।

ব্যক্তিগত সুখদুঃখ হইতেই, সার্ব্বজনীন সুখদুঃখের অভিজ্ঞতা জন্মে। কিন্তু ব্যক্তিগত সুখদুঃখের মধ্যে অনেক অসঙ্গতি, অবিচার, অসমানত্ব, বিক্ষোভ ও বিরোধ থাকে, যাহা অন্য ব্যক্তির অজ্ঞাত বা অপরীক্ষিত—সেই জন্য ব্যক্তিবিশেষের ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ কাহিনী সাহিত্যে স্থায়ী স্থান লাভ করিতে পারে না। সাহিত্যকারের কার্য্য সেই নিজের কাহিনীকে বহুর উপযোগী করা—যাহা সকল কালে সকল মানবই আপনার বলিয়া অভিনন্দন করিয়া লইতে পারে। ফটোগ্রাফে সময়বিশেষের রূপটিই ধরা যায়, কিন্তু তাহার দেহমধ্যস্থ রোগের বা বহুদিন পরের জরাজীর্ণ ও বিকৃত কুরূপের কোনো পরিচয়ই পাওয়া যায় না। কিন্তু সাহিত্যকার রূপ এবং রূপাতীতকে মাধুর্য্য এবং ঐশ্বর্য্য দিয়া এমন করিয়া ধরিয়া দিবেন, যাহা লোকে চিরদিনের মত আপনার স্বরূপ বলিয়া নিঃসংশয় চিত্তে গ্রহণ করিতে পারে। সাহিত্যকার স্বর্ণকারের মত সোণাকে গলাইয়া পিটিয়া, বাঁকাইয়া, খুদিয়া, জুড়িয়া, মুড়িয়া এমন অলঙ্কার গড়ে—যাহা সকলেরই মনের মত হয়।

সৌন্দর্য্য মনের দুয়ারে ধাক্কা মারিবামাত্রেই, ভাব উঠিয়া আসিয়া তাহাকে দুয়ার খুলিয়া দেয় এবং সাদরে অভ্যর্থনা করে! আপনার পাশে বসায়! ভাব, মনের স্বর্গে, বিশ্বকর্ম্মার সৌন্দর্য্য-উপকরণ সরবরাহ করে মাত্র। ভাব পাথর কাটিয়া, পটে আঁকিয়া, কাগজে লিখিয়া, সৃষ্টি করে। সৌন্দর্য্য বাড়ীর কর্ত্তা, সে হাট বাজার করে, আফিস যায়, টাকা আনে, আর ভাব বাড়ীর গিন্নি, রঁাধে বাড়ে, রাখে

ঢাকে, সাজায় গোছায় এবং সকলকে খাওয়ায় পরায়। ভাব আবার খুব হুঁশিয়ার ওস্তাদও; সে এমন জিনিষ তৈরি করিতে চায় যাহা সকলেরই গ্রাহ্য হয়, যেন দোকানে অপছন্দ হইয়া পড়িয়া না থাকে! তাহাতে তাহার ব্যবসায়ে লোকসান্। কাজেই ভাবকে খুব ধীর হইয়া, চারিদিক বুঝিয়া সুজিয়া কাজ করিতে হয়। অধীর অসংযত হইয়া কাজে হাত দিলে চলে না; তাহা হইলে অসাবধানতা বশত হয়ত কোনো কোনো জিনিষ ঠিক মাপসই না হইয়া ছোট বড় হইয়া যাইতে পারে। মোট কথা, ভাবের নৈপুণ্য এবং একাগ্রতা যেমন চাই, সাহিত্য-সৃষ্টিতে সংযমেরও তেমনি প্রয়োজন।

এই সংযম আমাদিগকে উদ্দাম কল্পনার পঙ্কিল আবর্ত্ত হইতে বাঁচায়। অসংযত হইলে সৌন্দর্য্যও ঠিকমত উপলব্ধি করা যায় না। সাহিত্যের যে সৌন্দর্য্যের সহিত আমরা পরিচিত হই, তাহাতে সংযম আছে বলিয়াই, তাহা আমাদিগের নিকট এত আদরের। জৈব নিয়মে আহার নিদ্রা অপরিহার্য্য, কিন্তু তাই বলিয়া জীবনীশক্তি বর্দ্ধিত করিতে কেহ যদি অপরিমিত রূপে আহার ও নিদ্রায় প্রবৃত্ত হয়েন—তবে সে ব্যক্তির পরমায়ু বৃদ্ধি হয় কিনা, তাহা শরীরতত্ত্ববিদ্‌গণই সঠিক বলিতে পারেন। কাব্যে পুরাণে ইতিহাসে কিন্তু এই অসংযমের ফলে যে সেই ব্যক্তির অপমৃত্যু ঘটিয়াছে, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে।

সংযম ভিন্ন সৌন্দর্য্য রচনা হয় না, এবং যাহা সুন্দর নয় সাহিত্যে তাহার স্থানও নাই। এই সুন্দরই মঙ্গল। কারণ সৌন্দর্য্যের সর্ব্ববাদী-সম্মত একটা আদর্শ বা মাপকাটি কোনো কালে ছিলও না, এখনও নাই। তবে ইহা বোধ হয় অবিসংবাদী যে সৌন্দর্য্যবোধ কেবলি

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যই নয়, তাহার চেয়েও কিছু গভীরতর, একটা অনুভূতি। এই যে অনুভূতি—ইহা অনির্ব্বচনীয়, ভাষায় তাহার স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না। অন্তরের একটা নিগূঢ় প্রবৃত্তিকে ভাষাতীত এ রস গ্রহণ করিবার জন্য ডাকিতে হয়, ইন্দ্রিয়েরা অহা পারে না। ফুলের সৌন্দর্য্য যে ফুলের দলে, বীজে অথবা গন্ধে আছে তাহা বলিলে ফুলের প্রকৃত সৌন্দর্য্য বোঝা যায় না; অথচ সমগ্র ফুলটিতেও তাহার সৌন্দর্য্য পরিসমাপ্ত নয়। ফুলটি দেখিতে দেখিতেই কুঁড়ির কথা, বীজের কথা, বোঁটার কথা, ফোটার কথা আপনাআপনি মনে আসে! ক্রমশ তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফুলাতীত একটা প্রচ্ছন্ন রহস্য, একটা অনির্ব্বচনীয় সুকুমার পেলব সৌন্দর্য্য, আমাদের অন্তরকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। তাহার কুঞ্চিত বঙ্কিম দলগুলি, তাহার অননুকরণীয় মসৃণ বর্ণ, তাহার পরাগরেণু, তাহার গন্ধ, সেই অবেশে সব বিলুপ্ত হইয়া গিয়া—মনে হয়, ফুল যেন এক অজ্ঞাত সুন্দর দেশের রাজকুমার, মৃগয়ায় বাহির হইয়া পথ ভুলিয়া এখানে আসিয়া পড়িয়াছে। রমণীর কান্তিতে সৌন্দর্য্য আছে, রমণীয়তা আছে, কিন্তু সে সৌন্দর্য্য আমাদের মনকে তীব্র আলোক-সম্পাতে ক্ষণেকের জন্য চঞ্চল করিয়া তুলে মাত্র, কিন্তু সন্তানগর্ভা রমণীতে যে মাধুর্য্য ঐশ্বর্য্য এবং সৌন্দর্য্য আমরা দেখি, তাহাতে কি আমাদের মনে এক অপূর্ব্ব মঙ্গল রসের বার্ত্তা আনিয়া দেয় না?

যাহা নীচ হইতে আমাদিগকে উচ্চে লইয়া যায়, যাহা ক্ষণিক হইতে অনন্তে লইয়া যায়, যাহা অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যায়—তাহাই মঙ্গল। মানুষের প্রকৃত সৌন্দর্য্যানুভূতি মানুষকে ছোট হইতে বড়য় লইয়া গিয়া, এমন জায়গায় পৌঁছাইয়া দেয়, যেখানে সমস্ত ক্ষুদ্রতা,

অল্পতা, এবং নীচতার সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া মন এক অনির্ব্বচনীয় রহস্যের সন্ধান পায়। এ রহস্য ক্ষণিক নয়, ইহা অনন্তকাল ধরিয়া উপভোগ করিলেও, কিছুমাত্র ব্যয়িত হয় না। এই যে রহস্যময় অনুভূতি ইহার সীমা নাই শেষ নাই বলিয়া, ইহা অমৃত এবং নিত্য।

সুন্দরই মঙ্গল এবং নিত্য—তাই আজ পর্য্যন্ত রাম সুন্দর, সীতা সুন্দর, ভীষ্ম সুন্দর, দধীচি সুন্দর, উমা সুন্দর ; ত্যাগ ক্ষমা দয়া সুন্দর ; প্রেম প্রীতি নিষ্ঠা সুন্দর। এই মঙ্গল ও সুন্দরই সাহিত্যের রসবস্তু। এই জন্য সাহিত্যে কেবল সৌন্দর্য্যের স্থান, আর এই জন্য সাহিত্য নিত্য কালের মঙ্গলময়। যাহা অসুন্দর, তাহা সাহিত্যের অঙ্গে আভরণ না হইয়া, আবরণ হয়।

বৈষ্ণব যুগের নব চেতনায় এইরূপ একটা সুন্দর সাহিত্য রচিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। কিছু হইয়াও ছিল। পববর্ত্তী কালে রচিত এবং আজ পর্য্যন্ত বৈষ্ণব সাহিত্য নামে নির্ব্বিচারে যাহা চলিয়া আসিতেছে, তাহার অধিকাংশই অসুন্দর উচ্ছৃঙ্খলতার কাহিনী : তাহা কেবল বিলাসিনীর আভাষ-ইঙ্গিতের মতই ক্ষণেকের জন্য মনকে হরণ করে মাত্র, মনকে বরণ করে না। কারণ, পরবর্ত্তী অনুকরণশীল কবিদিগের রচিত বৈষ্ণব-সাহিত্যের মধ্যে যে সুরটি অতিপ্রবল, তাহা সুরার মত মস্তিষ্ককে আলোড়িত করে, হৃদয়ে অপূর্ব্ব রহস্যময়ী অনুভূতি জাগাইতে পারে না। এ সুর সুরার মত চঞ্চল করিয়া তুলে মাত্র, ফুলের মত সুরভি দিতে পারে না। এ মোটা তারের সুর। মিলনের আনন্দের মধ্যে যে বেদনা, বিরহের ব্যথার মধ্যে যে সুখ, নরনারীর চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা এবং পরস্পরের মধ্যে যে জন্মজন্মান্তরের অটুট নিগূঢ় সম্বন্ধ—তাহার

মধ্যে পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিগণ কেবল দেহের মিলনটাকেই খুব বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন বলিয়া এবং তাহাকেই সকলের উপরে আসন দেওয়ায়, পূজনীয় আদর্শ চরিত্র, অবতার কিম্বা সাক্ষাৎ ভগবান্ যাহাই বল, শ্রীকৃষ্ণরাধার প্রেম মিলন বিরহ ও আকাঙ্ক্ষা নিতান্তই সাধারণ ধারণার অনুগামী, তুচ্ছ দৈহিক পরিতৃপ্তির কাহিনীতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। তিক্ত রস শারীর স্বাস্থ্যে উপকারী বলিয়া মানুষ নিম পাতার ঝোল খায়। নিপুণ পাচক তাহাকেই মুখরোচক করে, কিন্তু আনাড়ি তেতোর ঝোলে যদি তেতোকেই অতিপ্রাধান্য দিয়া বসে, তাহা হইলে উক্ত ব্যঞ্জন মুখরোচক হওয়া দূরে থাকুক্, ন্যাক্কারজনকই হইয়া থাকে। নরনারীর মিলনে যৌন সম্বন্ধটিই যদি প্রাধান্য পায়, তাহা হইলে তাহা হয় অসুন্দর এবং কুৎসিত। মনও তাহা গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত হয়!

এই কাব্যগুলিকে আবার আধ্যাত্মিকতার পোষাক পরাইয়া কোন কোন সমালোচক সাহিত্যসৌন্দর্য্যজ্ঞানের চূড়ান্ত পরিচয় দিতেছেন। শ্বেতাঙ্গদিগের সভায় ইংরাজী-পোষাকে ভারতবর্ষীয়দিগের মত, আধ্যাত্মিকতার পোষাকে এইগুলিকে অত্যন্ত বিসদৃশ ও হাস্যকর লাগে।

বৈষ্ণবসাহিত্যে চিরন্তন নরনারীর প্রাণের যে গোপন সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা বিশ্বসাহিত্যে নূতন; কিন্তু পরবর্ত্তী কবিদিগের রসজ্ঞানের অভাবে তাহা বড়ই বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার কারণ, এই কবিরা সর্ব্বত্র সংযম রক্ষা করিতে পারেন নাই, যে-সংযমের অভাবে তাঁহাদের নয়নসম্মুখ হইতে নিত্য সৌন্দর্য্যের মঙ্গলময় পটখানি যবনিকার অন্তরাল হইতে উঠিবার অবসর পায় নাই। তাঁহারা ইন্দ্রিয়দ্বারা যাহা দেখিয়াছিলেন, রসানুভূতির স্পর্শ না দিয়া তাহাই লিখিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্বে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, সাহিত্যের সৌন্দর্য্য কেবলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। তাঁহারা নরনারীর দেহের সম্বন্ধেই এমনি উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন যে দেহাতীতের আর খোঁজই করিলেন না। কাজেই, সৌন্দর্য্যবোধের জীবনকাঠিটির অভাবে পরবর্ত্তী অধিকাংশ বৈষ্ণব কবিতাই আজ নির্জ্জীব। বৈষ্ণবেরাই এদেশে প্রথম নবযুগের সুর পাইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাহার মূলটি সেই আনন্দাতিশয্যে এবং ভাবোন্মাদনায় যে একবার হারাইয়া ফেলিলেন, আর সেটির কেহ সন্ধানও করিল না, অথবা তাহার কোনও উচ্চবাচ্যও হইল না। কি যে হারাইল তাহা যখন জানা গেল না, তখন কিছু যে হারাইল তাহাও কেহ গণ্য করিল না। সুতরাং মূল চাপা পড়িয়াই রহিল। উৎসবের সমারোহে যাহা চক্ষে পড়ে নাই, উৎসবান্তে তাহা জানিতে পারা গিয়াছে বলিয়া, কেহ যদি এখন সেই ব্যাপার লইয়া অকারণ বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হয়, তবে কেহই তাহার বুদ্ধির তারিফ করিবে না।

সাহিত্য যে নূতন গতিলাভ করিয়াছিল, তাহা ক্রমশ দুর্গতিতে পরিণত হইল।

বৈষ্ণবসাহিত্যের পরবর্ত্তী বাংলা সাহিত্যই আমাদের বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্যের যুগ। *

---

* কলিকাতা "সাহিত্য-সেবক-সমিতি"তে পঠিত।

নারায়ণ, আশ্বিন, ১৩২৭

সাহিত্যে স্বৈরাচার

কিছু লিখিলেই যে তাহা সাহিত্য হইবে এবং তাহা ছাপাইলেই যে স্থায়ী হইবে, এরূপ মনে করা নিতান্ত বাতুলতা। কেন না, তাহা হইলে যে কোনও ব্যবসাদারের সচিত্র ক্যাটালগগুলি অতি মূল্যবান্ সাহিত্য বলিয়া এতদিন নিশ্চয়ই পরিগণিত হইত। কিন্তু উক্ত ব্যবসায়িগণ যখন সেগুলিকে সেরূপ কিছু বলিয়া চালাইতে চাহে না, তখন আমাদেরও তাহাদের সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু অ-সাহিত্যকে সাহিত্য বলিয়া যদি কেহ প্রচার করে, তাহা হইলে কি অমনিই আমরা তাহাকে নির্ব্বিচারে সাহিত্য বলিয়া মানিয়া লইব? ট্যাংরামাছকে ভেটকী-মাছ বলিয়া মৎস্যবিক্রেতার চালাইবার চেষ্টা কিছু বিচিত্র নহে, কিন্তু তাহার প্রকৃত জাতিনির্ণয় ক্রেতার বিদ্যা-বুদ্ধির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

বর্ত্তমান কালে বাঙ্গলা-সাহিত্যের হাটে এমনই অনেক ভেজাল ও মেকি আসিয়া জুটিয়াছে। জনকয়েক সাহিত্যিকযশঃপ্রার্থী অপরিণত-বয়স্ক যুবক তাহাদের খুসীমত, জ্ঞানমত ও অভিজ্ঞতামত অশ্লীল ও কদর্য্য গল্প এবং কবিতা লিখিয়া, নিজেরাই মাসিক-পত্র বাহির করিয়া তাহাতে ছাপাইতেছে। এতদিন এ খবরটা সাধারণ সাহিত্য-রসিকদিগের মধ্যে একরূপ অজ্ঞাতই ছিল। সাহিত্যিকরাই যখন এই সব রচনার বিষয়ে এমন অজ্ঞ ছিলেন, তখন দেশের অন্য লোকের কথা বলাই বাহুল্য।

ভদ্রজনসমাজে এসব লেখার প্রচার দূরে থাকুক, তাঁহারা এ যুগে এ জাতীয় লেখার অস্তিত্ব পর্য্যন্তও যখন অবগত ছিলেন না, বঙ্গ-সাহিত্যের নাট্যশালায় তখন অকস্মাৎ আর এক দল লেখকের আবির্ভাব হইল, যাঁহারা পুলিসের বোমা-আবিষ্কারের মত, এই অশ্লীল সাহিত্যের জন্ম ও তাহাদের পিতৃ-মাতৃ-পরিচয় আবিষ্কার করিয়া—খুব জোর-গলায় ভদ্রলোকদিগকে এই বিপদাশঙ্কার বার্ত্তা জানাইয়া দিয়া, সাবধান করিয়া দিতে লাগিলেন! অকস্মাৎ পথিমধ্যে "চোর, চোর" শব্দ শুনিয়া পথিকেরা যেমন চোর খুঁজিতে সুরু করে, কৌতূহলীর দলও তেমনই অশ্লীল সাহিত্য খুঁজিতে লাগিল। সকলে মিলিয়া খুঁজিয়া, অন্ধকার গলিতে লুক্কায়িত তস্করমহাশয়কে অবশেষে লোক-লোচনের সম্মুখে আনিয়া দাঁড় করাইয়া দিল।

এই সব অশ্লীল লেখাও এমনই করিয়া ভদ্রসমাজের গোচরে আসিল। অশ্লীল রচনার আবিষ্কারকগণ আশঙ্কা করিলেন যে, ঈদৃশ রচনাবলী জনসাধারণের সুনীতির পরিপন্থী এবং ইহা দ্বারা দেশের নরনারীগণের নীতি ও রুচি কলুষিত হইতে বসিয়াছে।

কোনও দেশের লোক যে পুস্তক পড়িয়াই খারাপ হয়, এ কথা, আর যিনিই করুন, আমি বিশ্বাস করি না। এই সব অশ্লীল রচনার বহু পূর্ব্বে রচিত হাজার হাজার নীতি ও ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিয়াও লোকে এতকাল খারাপ হইয়া আসিতেছে—ইহা আমরা সকলেই দেখিয়াছি এবং এখনও দেখিতেছি! আর খারাপ হইতে হইলে যে বিশেষ কোনও সাহিত্য বা অ-সাহিত্য পাঠ করিতে হয়—এ কথাও নিতান্ত অযৌক্তিক। সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করিয়া লোক যখন সাধু হয় না,

তখন অশ্লীল রচনা পড়িয়াই বা তাহারা খারাপ হইতে যাইবে কেন? আসল কথা, লোকের খারাপ হওয়া না-হওয়া কোনও রচনাপাঠের উপর ততটা নির্ভর করে না, যতটা করে সেই ব্যক্তিবিশেষের নিজ প্রকৃতি, প্রবৃত্তি ও অবস্থার উপর।

এই জন্যই আমার মনে হয়, সাহিত্যের রাজসভায় যে এই কারণে একটা প্রবল চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা নিতান্তই অকারণ শুধু নহে, ইহাকে স্বীকার করিয়া এতটা প্রাধান্য দেওয়াটাই অন্যায় ও অশোভন। অশ্লীল রচনা খুব দোষের সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই সব অজ্ঞাত রচনাবলীকে প্রকাশ্যে টানিয়া আনিয়া, তাহাদিগের বিচার করিবার নামে তাহাদিগকে অযথা প্রচারিত করাও, অশ্লীল রচনাকারের মতই নিন্দনীয় নয় কি? অশ্লীল রচনাকারী এবং সেই অশ্লীলতার আলোচনাকারী উভয়ের মনোবৃত্তিই, মনোবিজ্ঞানমতে, একই শ্রেণীর। যাহা অসুন্দর, তাহার আলোচনাও কখনও সুন্দর হয় না।

এখন, এই যে লেখা—যাহার বিরুদ্ধে এই দুরন্ত অভিযান আরম্ভ হইয়াছে, সেগুলি আসলে যখন সাহিত্যই নয়, তখন তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনাও নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন। সাহিত্য বলিতে বুঝি, যাহা জাতির অন্তর হইতে সমুদ্ভূত এবং তাহার প্রাণ-রসে পরিপুষ্ট হইয়া, সেই জাতির রস-ঘন সত্যমূর্ত্তিটিকে জগৎসমক্ষে ধরিয়া দেয়। সাহিত্য কাহারও ফটোগ্রাফ নয়, চিত্র; ইতিহাস নহে, সঙ্গীত; ডাইরি বা জমা-খরচের খাতা নহে—একটু আনন্দ, একটু সৌন্দর্য্য, একটু মধু। এই জন্য সাহিত্য কোনও একটা বিশেষ কালের নয়—সে নিত্য, চিরন্তন, শাশ্বত; কোনও ব্যক্তি বা শ্রেণীবিশেষেরও নয়—সে সার্ব্বজনীন;

কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট বিষয়েরও নহে, সে সব বিষয়ের মধ্যে বিষয়াতীত, এই জন্য সর্ব্বব্যাপী এবং বিরাট! সাহিত্যে কল্পনার রং আছে, কিন্তু সে-রংয়ের পরপারে পাওয়া যায় অদ্বৈত সত্যকে; সাহিত্যে অলকার ঐশ্বর্য্য ও শ্মশানের চিতা-ভস্ম মিশিয়া, সে হইয়াছে মৃত্যুঞ্জয়ী শিব। শিবের ললাট-বহ্নির তেজে মদন ভস্মীভূত হয়। এই সাহিত্য: ইহাকে পাইতে হয় সাধনার ভিতর দিয়া ও তপস্যার মধ্য দিয়া—যেমন দাক্ষায়ণী সতী শিবকে পাইয়াছিলেন অপর্ণা তপশ্চরণ করিয়া।

এখন দেখা যাউক, এই সব বহুনিন্দিত রচনাবলীতে সত্য, সুন্দর ও শিবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কি না। অবশ্য এ প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দেওয়া সম্ভবপর নহে। দিতে হইলে, এই সমস্ত রচনা অভিনিবেশসহকারে পড়িয়া, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার আলোচনা ও বিশ্লেষণ করিয়া যুক্তি-তর্ক দিয়া প্রমাণ করিতে হয়। কিন্তু সে সময় নাই এবং সে ক্ষেত্রও ইহা নহে। সুতরাং সেরূপ কিছু না করিয়া কেবলমাত্র ইহাদের রচনার বিষয়বস্তু ও ধারা এবং বর্ণনা-ভঙ্গী ও ব্যঞ্জনা হইতেই, আমি তাহার আলোচনা করিব।

এই আধুনিক রচনাকারীরা যেন কয়েকটি বিশেষ সমস্যা ও বস্তুর পক্ষ গ্রহণ করিতেই কলম ধরিয়াছেন, ঠিক সাহিত্য-রচনার সদুদ্দেশ্যে প্রণোদিত হন নাই। দারিদ্র্য-সমস্যা এবং দৈহিক ক্ষুধা ও তাহাদের পরিতৃপ্তিই, ইহাদের রচনার প্রধান বিষয়। আর ইহার পশ্চাতে, নূতন-কিছু করার একটা প্রচণ্ড অহঙ্কার তাহার জয়ঢাক বাজাইতেছে! এই জাতীয় সব লেখাই যেন তারস্বরে একবাক্যে বলিতেছে—আমরা জগতের উপেক্ষিতদিগকে, নিন্দিতদিগকে ও তুচ্ছতমগণকে সম্মান দিতেছি,

তোমরা আমাদের দুঃসাহস দেখ। যে-কার্য্যে আমরা হস্তক্ষেপ করিয়াছি, সে কার্য্য কেহই এতদিন করে নাই, কাজেই ইহাই আমাদের আনীত, সাহিত্যে নবযুগ।

অথচ ইঁহারা গোড়াতেই একটা মস্ত গলদ করিয়া বসিয়াছেন। ইঁহারা মানেন না অথবা জানেন না যে, সমস্যা-মূলক রচনাবলী অতি উচ্চাঙ্গের হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। কিন্তু সেগুলি যে ঠিক সেই কারণেই সাহিত্য-পদবাচ্য হইবে—তাহারও কোনও কারণ নাই। উদ্দেশ্যমূলক রচনামাত্রই কিছু সাহিত্যপর্য্যায়ভুক্ত হয় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যাহা সাহিত্য, তাহা সার্ব্বজনীন এবং সর্ব্বকালের।

মানবজাতির চিরন্তন সমস্যাকে ভিত্তি করিয়া যাহা সুপ্রতিষ্ঠিত, যে-সমস্যার কোনও দিন সমাধান হয় নাই বা হইবেও না, যাহা কোনও ব্যক্তি বা সমাজবিশেষের নিজস্বও নয়—তাহা সাহিত্য হইতে পারে। সাহিত্যকারের যে দৃষ্টিভঙ্গী থাকা দরকার, মনের যে প্রসারের প্রয়োজন—তাহার অধিকারী, কলম ধরিলেই হঠাৎ হওয়া যায় না। দারিদ্র্য-সমস্যা লইয়া সত্যকারের সাহিত্য-সৃষ্টি সম্ভব না হইলেও, ও-বিষয়ের গবেষণা করিলে, হয়ত দারিদ্র্য-নিবারণী এবং জনহিতকরী কোনও ব্যবস্থা বা বড় জোর কিছু গ্রন্থ রচিত হইতে পারে—যাহা অধ্যয়ন করিলে দেশের ধন-বৃদ্ধি ত হইবেই, উপরন্তু ভারতবর্ষ ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারে—এরূপ সম্ভাবনাও করিতে পারা যায়! কিন্তু দুঃখের বিষয়, ঈদৃশ জ্ঞানগর্ভ পুস্তককেও রসিকগণ সাহিত্যের পংক্তি হইতে বহু দূরেই রাখিবেন, কখনই তাহাকে সাহিত্যের মর্য্যাদা দিবেন না।

কলিতে জীবের অন্নগত প্রাণ! অন্ন অতি প্রয়োজনীয় বস্তু, সন্দেহ নাই, কিন্তু তাই বলিয়া অন্ন কখনও মধু নয়। মধুর স্থানে অন্ন কেহই গ্রহণ করিবে না। নবীন লেখকগণ তাঁহাদের উল্লিখিত রচনাগুলি যতই সাহিত্য বলিয়া চালাইতে চেষ্টা করুন না কেন, রসিক-ভবীগণ নিশ্চয়ই তদ্দ্বারা প্রতারিত হইবেন না। বিবাহ-সভায় বিনামুল্যে বিতরিত প্রীতি-উপহারের পস্তকে, একটি উৎকৃষ্ট কবিতা বলিয়া চালানও তাহা হইলে অশোভন নয়।

এই সব রচনায় দৈহিক ক্ষুধালালসাকে অতিমাত্রায় প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। এ প্রচেষ্টাও নূতন নহে। রস-শাস্ত্রে **আদিরস** যেমন আছে, **শৃঙ্গাররসও** ঠিক তেমনি বিগুমান, কিন্তু অশ্লীলরস বলিয়া জগতের সাহিত্যে যে কিছু আছে, তাহা এখনও শুনা যায় নাই। সংস্কৃত, ফরাসী ও ইংরাজী সাহিত্যে শৃঙ্গাররস একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। মহাকবি কালিদাস, মোঁপাসা, জোলা, শেকস্‌পীয়ার, বাইরণ প্রভৃতি প্রতিভাধরদিগের শৃঙ্গাররসাত্মক বহু রচনা আজ পর্য্যন্ত বিশ্বের নর-নারীকে অনির্ব্বচনীয় রস পরিবেষণ করিয়া আসিতেছে এবং করিবেও। অনশ্লীল শৃঙ্গার-রস রস-রচনার চূড়ান্ত নিদর্শন। উভয়ের মধ্যেই মাদকতা থাকা সত্ত্বেও, মধু ও মহুয়ার রস যেমন এক পদার্থ নহে, তেমনি শৃঙ্গাররসাত্মক ও অশ্লীল রচনাও এক জাতীয় নহে।

বঙ্গসাহিত্যেও শৃঙ্গাররসের দৃষ্টান্তের অভাব নাই। ভারতচন্দ্র হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত সকলের কাব্যেই শৃঙ্গাররসাত্মক রচনা কিছু আছে, যে গুলি বঙ্গ-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। কিন্তু তাহা যে অশ্লীলতা-দোষে

দুষ্ট, এ কথা বোধ হয়, কোন সাহিত্যরসবিদই বলিবেন না : গোঁড়া নীতিবাদীর কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। তেঁতুল দেখিলেই দাঁত টকিয়া উঠে, এমন লোকও আছে, আবার এমনও অনেক আছেন—যাঁহারা অম্লরসে অপূর্ব্ব চাটনিও প্রস্তুত করিতে পারেন। রস উপভোগ করা না-করা নিজ নিজ শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রুচিসাপেক্ষ! কিন্তু এ কথা রসেরই, নীরসের নহে।

শৃঙ্গাররস রচনা করিতে গিয়া যেখানে রস না হইয়া রসের গাদ তৈরী হইয়া পড়ে, সেখানে আর যাহারই উপভোগ্য বস্তু থাকুক, রসিকের সেখানে কিছুই থাকে না। রসের ভিয়ান করিতে যে বসিবে, তাহার সর্ব্বাগ্রে রসের মাপ ও ভাগটা জানা বিশেষ প্রয়োজন! ভাল রাঁধুনী যে, সে ভাল ভাল রাঁধুনীর সাহচর্য্যে ও শিক্ষায় তবে ভাল রাঁধুনী-পদবীতে উঠে। নিপুণ রাঁধুনী জানে যে, লবণই সব ব্যঞ্জনের প্রাণ; কিন্তু ব্যঞ্জনকে অধিকতর সুস্বাদু ও মুখ-রোচক করিবার নিমিত্ত মাপাতিরিক্ত লবণ দিলে সেটা যে কিরূপ সুখাদ্য হয়, তাহাও কাহারও অবিদিত নাই। রস-রচনাও ঠিক তদ্রূপ। এই যে আধুনিক রচনাগুলি এমন হুঙ্কারজনক, বীভৎস এবং অশ্লীল, তাহার প্রধান কারণ এই যে, উক্ত রচয়িতাদের রসজ্ঞানের একান্ত অভাব।

ইহা ছাড়া আরও কতকগুলি কারণ আছে : যেমন, ইহাদের নূতন-কিছু-করার এক উদ্ধত দাবী। যে পাশ্চাত্য মহাসাহিত্য হইতে এই অতি-আধুনিক রচনার প্রেরণা এবং যাহাদের ব্যর্থ অনুকরণে এই সব রাবিশের সৃষ্টি, তাহাতে কিন্তু আমরা অন্য রূপ দেখি। পাশ্চাত্য লেখকগণের রচনায় বীভৎসতার নগ্নমূর্ত্তি আমরা দেখি

সত্য, কিন্তু তাহা ঘৃণার জন্য এবং ঘৃণা করিতে; সেগুলি পাঠকের জ্ঞানাঞ্জনশলাকা, পাঠক তদ্দ্বারা সচেতন হয়! কিন্তু এ সব লেখা পড়িলেই মনে হয় যে, অশ্লীলতাটাকে এবং মানব অন্তরের ঘুমন্ত পশুটাকে খোঁচাইয়া জাগাইয়া দিয়া বীভৎস একটা ব্যাপার ঘটাইবার এক দুর্জ্জয় স্পৃহা, অসম্ভব অভিমান এবং একটা ইতর আনন্দই যেন ইহাদিগকে সবলে পরিচালিত করিতেছে। অশ্লীলতা ও রিরংসাপ্রচারের জন্যই যেন উক্ত সব রচনার অবতারণা।

রচনাকে সত্য, সার্থক ও রূপময় করিতে হইলে যে রসায়নের প্রয়োজন, তাহাকে প্রাধান্য দেওয়াই রচনার উদ্দেশ্য নয়। তাহা করিতে গেলে রচনা আর রচনা থাকে না, সেটা হইয়া দাঁড়ায় সেই রসায়নের বিজ্ঞাপন ও বাহন মাত্র। একখানি চিত্রে লাল রঙের প্রয়োজন আছে বলিয়া, যদি কেহ তাহাতে যথেচ্ছভাবে প্রয়োজনাতিরিক্ত লাল রংই খানিকটা ঢালিয়া দেয়, তাহা হইলে সেখানা আর যাহাই হউক, চিত্র হয় না। রচনা রসের বাহন, কিন্তু রস যদি রচনার বাহন হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে হয় ত নূতন একটা কিছু হইতে পারে, কিন্তু হয় না কেবল রস বা রচনা। সোণার অলঙ্কার দেহের শোভা: এবং অলঙ্কার গড়িতে কিছু পা'নের প্রয়োজন হয়, যাহা সোণাকে অলঙ্কারের যোগ্যই করে।

দৈহিক ক্ষুধা ও লালসা, জৈবধর্ম্মে মানুষের সহজাত, এই জন্য অপরিবর্জ্জনীয়। অন্যান্য জীবের ন্যায় স্ত্রীলোকের দেহের প্রতি আকাঙ্ক্ষা ও কামনা পুরুষের অত্যজ্য স্বভাব। কিন্তু মানুষ সংস্কৃতি সংস্কার ও কৃষ্টি দ্বারা এমন কতকগুলি বিধি-নিষেধ এবং আইন-কানুন

তৈরী করিয়া লইয়াছে, যেগুলি এতদিন পরে জগতের সকল সভ্য-সমাজেই সাদরে গৃহীত হইয়াছে। অবাধ স্ত্রী-পুরুষমিলনের দিনও পৃথিবীতে একদিন ছিল, কিন্তু সেটি মানুষ বুদ্ধি ও বৃত্তির ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পরিত্যাগ করিয়াছে, করে নাই কেবল কোনও কোনও অসভ্য বন্য জাতি এবং পশুরা। ক্রমশ মানুষের সূক্ষ্ম রস-জ্ঞান ও শ্লীলতাবোধের উন্মেষের সহিত শৃঙ্গারসম্বন্ধীয় যত কিছু ব্যাপার, এমন কি, নাম সংজ্ঞাগুলি পর্য্যন্ত মানুষ গোপন করিতে শিখিল।

বর্ত্তমান যুগের দারিদ্র্য-সমস্যা যখন অত্যন্ত প্রবলাকার ধারণ করিয়াছে, তখনই এ নিয়ম সৃষ্ট হয় নাই—যদিও উক্ত সমস্যার সহিত অশ্লীল রচনার কোন সম্বন্ধই আমরা ঠিক ধরিতে পারিতেছি না। অশ্লীলতা বর্জ্জন-বিধি প্রথম যখন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তখন তার বেতার রয়টার দূরে থাকুক, এমন কোনও খবরের কাগজ কি মাসিক পত্রও একখানা ছিল না, যাহা দ্বারা এক দেশের খবর অন্য দেশে নীত হইত, এবং সকলে তাই পড়িয়া শিখিত। দেখা যাইতেছে, পৃথিবীতে কেহই যখন কাহারও অস্তিত্ব পর্য্যন্ত জানিত না, তখন তাহারা এই দেহলালসা এবং রিরংসার উত্তেজক কাহিনী বা ব্যাপার, তাবৎ লোক-চক্ষুর আড়ালে রাখার নিতান্ত প্রয়োজনীয়তাটা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছিল। আর সেই অজ্ঞাত অতীত কাল হইতেই সর্ব্বদেশের সুধী-সমাজ এই তৃতীয় জৈব-ক্ষুধাকে সংহত ও সংযত করিতে প্রাণপণে যত্নবান্ হইয়াছেন।

অতিআধুনিক লেখার মধ্যে এই সব তরুণেরা খুব জোরের সহিত দেখাইতে চাহেন যে, আমাদের বর্ত্তমান সমাজ মনুষ্যত্বের উদ্বোধনের এবং প্রকৃত মনুষ্যত্বের পরিপুষ্টির একেবারেই উপযোগী নহে, তাহার কারণ,

ইহাতে অবাধ মিলন, প্রকাশ্য মিলন প্রভৃতি মনুষ্যত্বের (?) পরিপোষক বিধি নাই !! এই জন্য, ইহারা গল্পে কবিতায় প্রবন্ধে তাঁহাদের অভীপ্সিত চিত্র অঙ্কিত করিয়া সমাজ-সংস্কারে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন! দৈহিক-লালসা ও ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির মধ্য দিয়াই যেন সমাজ সংস্কৃত হইবে! আর তদ্দ্বারা দারিদ্র্য-সমস্যা, শ্রমিক-গণ্ডগোল, বেকার-বিপত্তি প্রভৃতি সমস্ত সমস্যা একেবারে দূর হইয়া গিয়া, জগতে স্বর্গরাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইবে !!

সত্য সত্যই এমন এক দিন ছিল। তখনও মানুষ ছিল—আর, সে মানুষেরা এই সব মানুষদেরই পূর্ব্বপুরুষ। তাঁহারাই কিছু দিন পরে, বর্ত্তমান বিধিনিষেধগুলির খস্‌ড়া তৈরী করিয়াছিলেন! দৈনন্দিন বুদ্ধির উৎকর্ষে, জ্ঞানের বৃদ্ধিতে এবং অভিজ্ঞতার সাহায্যে তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, আদিম প্রথানুসরণ পশুর কার্য্য হইতে পারে, কিন্তু পশুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি মানুষের নহে। যুগে যুগে এই বোধটাই স্পষ্ট ও দৃঢ় হইতে হইতে আসিয়া বর্ত্তমানে দাঁড়াইয়াছে, তাই আজ পর্য্যন্ত সে আদিম প্রথার পুনঃপ্রতিষ্ঠা আর সম্ভব হইল না।

এই তৃতীয় ক্ষুধার শত তাড়না সত্ত্বেও, মানুষ আজ পর্য্যন্ত অবনত মস্তকে বিধিনিষেধগুলিকে মানিয়া আসিতেছে! তারপর, জানি না, কবে কোন্ এক শুভ মুহূর্ত্তে শৃঙ্গারের দেহ নিংড়াইয়া তাহার রসটুকু মাত্র লইয়া আনন্দের এক অপূর্ব্ব প্রস্রবণ সৃষ্ট হইল। ইহারও পরে, আরও মার্জ্জিতরূপে ও অভিনবভাবে চিত্তের হ্লাদিনী শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ দেখা দিল। অন্তরের সহস্রদল অরবিন্দ ফুটিয়া উঠিল। মানুষ শৃঙ্গারের কণ্টকিত শৃঙ্গ উত্তীর্ণ হইয়া শালীনতার শুভ্র কৈলাসশিখরে আরোহণ

করিয়া লাভ করিল—আদিরস। এই দিনেই মানুষের তপস্যা সমাপ্ত হইল : মানুষ মানুষ হইল। আর পশু—সে পশুই রহিয়া গেল।

আজ তাই বারম্বার মনে হইতেছে, মানুষের বিদ্যাবুদ্ধি কি চরমোন্নতির শেষ সীমান্তে পৌছিয়াছে? তাহাই যদি না হইবে, তবে মানুষ মানুষের কোঠা হইতে আবার পশুত্বের দিকে ঝুঁকিতে এত ব্যস্ত কেন? মানুষ পশুত্বকে বর্জ্জন করিতে এবং পশুভাব হইতে মুক্তিলাভ করিতে, আদিম তৃতীয়ক্ষুধাকে শিল্প, কলা, সাহিত্য ও শালীনতা হইতে বহু দূরে ঠেলিয়া রাখিতে এতদিন ধরিয়া অক্লান্তভাবে প্রয়াস পাইতেছে : কারণ, আরও উন্নতিকামী বিবর্ত্তন-শীল মানুষ তাহার শ্রেষ্ঠত্ব সপ্রমাণ করিয়া আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চায়। কাজেই যাহা তাহার উচ্চবৃত্তির বিরোধী, তাহাই তাহার পরিত্যাজ্য। এ কারণ শ্লীলতার পরিপন্থী নীরস অশ্লীলতা তাহার সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। অশ্লীল রচনা যতই নীরস হউক না কেন, পাঠকের মনে তাহা ক্ষণিকের জন্যও একটা উত্তেজনা আনে সত্য, কিন্তু তাহা প্রসন্নতা বা আনন্দ নহে। এই উত্তেজনা বা চাঞ্চল্যকেই এই অশ্লীল লেখকগণ আনন্দ ভাবেন। তাঁহারা জানেন না যে, রস ছাড়া আনন্দের অন্য জন্মস্থান নাই। আর রস দশ-বিশটা নাই, মাত্র নয়টাই এবং তাহার কোনওটির মধ্যেই অশ্লীলতার স্থান নাই!

রসের রং মাখাইয়া কোনও রচনা চালাইতে গেলে তাহা সাহিত্য হয় না, সং হয়; সং-এর জন্য কৌতূহলও লোকের অল্প নয়। তাহার প্রমাণ, চৈত্র-সংক্রান্তির সংয়ে ভিড় দেখিলেই বুঝা যায়। অশ্লীল রচনা সাহিত্যের রূপ নয়, বিদ্রূপ।

ঢাক ঢোল পিটাইয়া যাহাকে আত্মপরিচয় দিতে হয়, তাহার পরিচয়ে

বিশেষ একটা গোল থাকে। চিত্র আঁকিয়া যদি বুঝাইয়া দিতে হয় যে, সে কিসের চিত্র, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, উক্ত ছবিখানি প্রদত্ত পরিচয়োক্ত বস্তু ছাড়া বহু জিনিষকেই বুঝাইতে পারে, তাই ঐ ভূমিকার প্রয়োজন! আর ঠিক এই কারণেই বোধ হয়, ইঁহারা ইহাদের রচিত অশ্লীল রচনাগুলিকে সাহিত্য বলিয়া প্রমাণ করিতে এত লালায়িত!

যে প্রকৃত রস-স্রষ্টা, সে উদ্দেশ্যবিহীন হইয়া শুধু অকারণেই আপনার আনন্দে আপনি বিভোর হইয়া কেবলি সৃষ্টি করিয়া যায়। এই সৃষ্টি করাতেই তাহার সুখ। শিল্পীর মনে বেগবতী নদীর ঢেউ, দক্ষিণের হাওয়া, ফুলের গন্ধ। শিল্পীর প্রাণ বেণুবনের বাঁশী, বাদকের ফুঁয়ে-বাজা বাঁশীর সুর নহে; সে উদার আকাশে চাঁদের আলো, গৃহ-কোণের ক্ষুদ্র দীপশিখা নহে; সে অন্তহীন উদধির বিচিত্র ঊর্ম্মি-লীলা, ক্ষুদ্র জলাশয়ের ক্ষীণ হিল্লোল নহে।

এই নব্য যুবকসম্প্রদায়ের আর একটি দোষ, তাঁহাদের পঙ্গু লিখনভঙ্গী অপটু প্রকাশ-কলা এবং অর্থহীন গ্রাম্য শব্দের বহুল প্রয়োগ। ইহাদের লিখন-ভঙ্গী (ইংরাজীতে যাহাকে style বলে) ঠিক বাঙ্গলা ভাষার লিখন-ভঙ্গী নহে। একটা নূতন ভঙ্গী প্রবর্ত্তন করিতে পারিলে, ফাঁকি দিয়া অমরত্ব লাভ করা যায় সত্য—কিন্তু সেটিকে ভাষার সঙ্গে খাপ খাওয়াইতে হইবে ত? বক্তব্যের অনেকটা প্রকাশ পায় লিখন-ভঙ্গীর দ্বারা, আর সেই ভঙ্গীই সুষ্ঠু, যাহা দ্বারা ভাষার নিজস্ব রূপ ব্যাহত না হইয়া শ্রীসম্পন্ন হয় এবং যাহা দ্বারা লেখকের বক্তব্যটির প্রকাশও সরস হয়।

অবশ্য এখানে বলিতে হইবে যে, বাঙ্গলা ভাষার এইরূপ অপূর্ব্ব ভঙ্গী ইতিপূর্ব্বে আরও কয়েকজন সাহিত্যিক চালাইতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং

এখনও কেহ কেহ করিতেছেন। কিন্তু সে style এ-পর্য্যন্ত সর্ব্বসাধারণ গ্রহণ করে নাই; তাহার কারণ, তাহাতে কৃত্রিমতাই সবটুকু এবং সহজবোধ্যতা ও স্বচ্ছন্দতার একান্ত অভাব। নৃত্যের লীলায়িত গতি ছন্দ ও ভঙ্গী খুবই মনোরম সন্দেহ নাই, কিন্তু সে ভঙ্গীতে চলা নিশ্চয়ই সুসাধ্য নহে। তাই এই নূতন লিখন-ভঙ্গী ভাষাতেও সর্ব্বজনগ্রাহ্য হইল না।

ইঁহারা নিজেদের অচল মনোভাবের পরিচয় দিবার জন্যই বোধ হয় এই অচল ভঙ্গীটি গ্রহণ করিয়াছেন। ভূমিকম্পে একটা অট্টালিকা ভূমিসাৎ হইলে তাহার দরজা-জানালা কড়ি-বরগা প্রভৃতি যেমন চতুর্দ্দিকে অবিন্যস্তভাবে ছড়াইয়া পড়ে, ইঁহাদের এই অপূর্ব্ব লিখন-ভঙ্গীতেও তেমনি কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়া বিশেষ্য বিশেষণগুলি, রচনার চারিপাশে অসংযুক্তভাবে ছড়ান থাকে। ক্রিয়ার রূপ সর্ব্বত্রই প্রায় বর্ত্তমানের (Present tense) ঃ যেমন লেখার বিষয়ও বর্ত্তমান কালোপযোগী—শুধু মুটে মজুর গণিকা এবং তৃতীয় ক্ষুধার প্রচণ্ড পীড়া! আর এই সব মুটে মজুর শ্রমিক ও বারাঙ্গনাদিগকে উপলক্ষ করিয়া স্পষ্ট পরিষ্কার বিশদ ও বিলম্বিতভাবে যে সব রিরংসার উদ্যোতক কাহিনী লিখিত হয়, তাহাই না কি বর্ত্তমান যুগের দারিদ্র্য-সমস্যা !!

আর এক দোষ, স্থানে অস্থানে অপ্রচলিত গ্রাম্য শব্দের প্রয়োগ-বাহুল্য। অকারণ ইঁহারা এমন সব অভিধানবহির্ভূত অর্থহীন শব্দ ব্যবহার করেন, যাহার অর্থ এক লেখক ব্যতীত, আর কাহারও বোধগম্য হইবার কোনও উপায় নাই।

এইখানে সমস্যাটি আরও জটিল হইয়া পড়িয়াছে, যাহার মীমাংসা

বোধ হয় এখনও সাধ্যাতীত নহে। এ সমস্যা, সাহিত্যে চল্‌তি কথার প্রচলন লইয়া।

কিছুদিন হইতেই এই চল্‌তি কথা নূতন করিয়া সাহিত্যে দেখা দিয়াছে। বহু প্রাচীন কালেও এরূপ কথ্য-ভাষা ব্যবহৃত হইত, যেমন 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রভৃতি হাস্যরসাত্মক লঘু রচনায় এবং প্রহসনে ; গম্ভীর সৎসাহিত্য রচনায় কেহই এ ভাষা ব্যবহার করেন নাই।

অদ্যকার সভাপতি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ই এ ব্যাপারের সর্ব্বপ্রধান পাণ্ডা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত এখন এই ভাষা ছাড়া লিখেন না। কিন্তু ইহা দ্বারা বাঙ্গলা ভাষাটিকে যে অযথা বিকৃত করা হইতেছে, সেটার সম্বন্ধে ত কেহই কিছু বলেন না ?

আমার আপত্তি এই যে, চল্‌তি ভাষার প্রচলনে, উচ্চারণ অনুযায়ী শব্দের ধাতুগত বাণান বদ্‌লাইয়া, নূতন বাণান দিয়া তাহাদের আসল রূপের আমূল পরিবর্ত্তন-সাধন করিতে হয়। যেমন কেহ লেখেন 'নতুন', কেহ লেখেন 'নোতুন্', অথচ আদি শব্দ 'নূতন' হইতে ইহাদের কত প্রভেদ ! এমনি করিয়া চল্‌তি ভাষার লেখকগণ স্ব স্ব ইচ্ছানুযায়ী প্রত্যেক শব্দের যদি নূতন নূতন বাণান লিখিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে ব্যাপারটা কোথায় গিয়া দাঁড়ায় ?

ক্রিয়াপদেও তাই। এক 'করিলাম' লিখিতে নিজ নিজ কথিত ভাষায়, কর্‌লাম, কল্লাম, কর্‌লুম, কল্লুম, কর্‌লেম, কল্লেম, কর্‌নু, কন্নু প্রভৃতি কত রূপই না হইতেছে ! ইত্যাকারে সুপ্রতিষ্ঠিত একটা ভাষার যদি ক্রমশ বিকৃতিই ঘটিতে থাকে এবং শব্দগুলি নিজ নিজ ধাতু ও

গোত্র হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া পড়ে, তাহা হইলে সেটি কি ভাষার পক্ষে বিশেষ গৌরবকর হইবে ?

উচ্চারণঅনুযায়ী লেখা পৃথিবীর অন্য কোন্ ভাষায় আছে জানি না, তবে ইংরাজীতে যে নাই, তাহা দেখা যাইতেছে। ইংলণ্ডে শুনিয়াছি, প্রত্যেক প্রদেশে শব্দের উচ্চারণ বিভিন্ন, কিন্তু সাহিত্যে লিখিত পদগুলির বাণান একই। সেটা বহুকাল হইতে সুনিয়ন্ত্রিত, সুসংস্কৃত ও সুবিধিবদ্ধ হইয়া আসিতেছে—তাহার গায়ে কেহই কখনও হস্তক্ষেপ করে নাই। মুখে কোনও শব্দের যেমনি উচ্চারণ হউক্ না কেন, সাহিত্যে তাহাকে স্থান দিতে কেহই অমন ব্যগ্র নয় বলিয়া, তাহাদের পরস্পরের শব্দের উচ্চারণগত বহু বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও, সাহিত্যের ভাষা বুঝিতে, তাহাদের এবং যে কোনও বিদেশীরও কোনই কষ্ট হয় না। কারণ, ইংরাজীতে সাহিত্যের ভাষা এক, অভিধান এক এবং ব্যাকরণও এক। যিনি যে প্রদেশেরই হউন না কেন, যেমনই তিনি উচ্চারণ করুন, লিখিবার সময় তাঁহাকে আদর্শানুযায়ী সাধুভাষা লিখিতেই হয়। Cat উচ্চারণ করিতে Kat কোনও ইংরাজই লিখিবে না, Psalmএর স্থানে Samও কেহ লেখেন নাই। Quay ও Key উচ্চারণ দুইয়েরই এক, কিন্তু সেজন্য ইহাদের উচ্চারণ বা বাণান বদ্‌লাইবার জন্যও কেহই বিশেষ চিন্তিত বলিয়া বোধ হয় না।

লিখিত ও কথিত শব্দের উচ্চারণগত বৈষম্য চিরদিন আছে, চিরদিনই থাকিবে—সব দেশে সব ভাষাতেই ইহা আছে। লিখিত ভাষা সাহিত্যের ভাষা—তাহা আদর্শ ভাষা, যাহা সর্ব্বকালে সব মানুষেই বুঝিবে। তাহাকে উচ্চারণগত করিতে গেলে, তাহাকে যে কেবল এই

যুগেই আদর্শচ্যুত করা হইবে, তাহাই নহে, অন্য যুগে যদি অন্যভাবে তখনকার লোক তাহার উচ্চারণ করে, তাহা হইলে তাহাকে আবার এক নূতন মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিতে হইবে এবং যুগে যুগে শব্দের এইরূপ পরিবর্ত্তনে ভাষা ত ভাসিয়া যাইবেই, তাহার সঙ্গে যাইবে জাতির সাহিত্যও। শব্দের পরিবর্ত্তনে এই ক্ষতিই সব চেয়ে বড় এবং অনিবার্য্য।

কাজেই, সাহিত্যে চল্‌তি ভাষার প্রচলন আমার মতে অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং অবিমৃষ্যকারিতার পরিচায়ক। ইহাতে আরও বিপদ আছে। যদি কথ্য ভাষাতেই সাহিত্যরচনা করিতে হয়, তাহা হইলে কলিকাতার ভাষাই শুধু লওয়া হইবে কেন? কলিকাতার ভাষার এমন কি সার্ব্বজনীনতার অধিকার আছে, তাহা একেবারেই আমার বুদ্ধির অগম্য। কথ্য ভাষাই যদি চালাইতে হয়, তবে বাঙ্গলার প্রত্যেক স্থানের ভাষাই লওয়া উচিত! ঢাকা, ময়মনসিং ও চট্টগ্রাম, বা রাঢ়ের ভাষাই তাহা হইলে বাদ যায় কেন?

চল্‌তি ভাষার লেখকগণ বলেন, চল্‌তি ভাষার নাকি নিজস্ব একটা জোর আছে, ইহা দ্বারা ভাষার শক্তি ও বেগ বাড়ে। হয় ত কোন কোনও স্থলে ইহা আংশিকভাবে সত্য, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই যে চল্‌তি ভাষা বিশেষ দুর্ব্বল, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কোনও গম্ভীর বিষয়ের বর্ণনায় বা গভীর চিন্তাশীল বিষয়ে চল্‌তি ভাষা মোটেই উপযোগী নহে। এ ভাষা এক চলে, লঘু বিষয়ে।

ভাষার জোর কি সাধু ভাষার দ্বারা হয় না? আমি তাহা বিশ্বাস করি না। বরং না-পারাটা লেখকের অক্ষমতাই মনে করি। জোর বাড়ানই যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে অনেক ক্ষেত্রে হিন্দী, উর্দ্দু বা ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিলে, চল্‌তি কথা অপেক্ষাও

অনেক বেশী জোর হয়। তবে কি তাহাই করিতে হইবে? যিনি বাঙ্গলা ভাষার লেখক হইতে চাহেন, তাঁহার বাঙ্গলা শব্দের ভাণ্ডার খালি থাকিলে, কি করিয়া চলিবে? বাঙ্গলা লিখিবেন অথচ বাঙ্গলা শব্দের দৈন্য, কাজেই অবাঙ্গলা শব্দের আশ্রয়গ্রহণ ছাড়া, আর ইঁহাদের উপায়ান্তর নাই। যিনি প্রকৃত ব্যবসায়ী তিনি জানেন, তাঁহার মালের উৎপত্তি-স্থান কোথায় এবং তিনি সেইখান হইতেই মাল আমদানী করেন, কারণ ভেজালে ব্যবসা চলে না।

চল্‌তি ভাষার পক্ষপাতিগণ আরও বলেন যে, এতদ্দ্বারা ভাষার শব্দ-সম্পদও নাকি বাড়িতেছে। অকারণ কতকগুলি ফার্শী আর্‌বী গ্রাম্য ও আজ্‌গুবি শব্দ ভাষায় ঠাসিয়া দিলেই যে, ভাষার সম্পদ বাড়ে, আমার সে ধারণাও নাই। অনেক লোক আছেন, যাঁহারা মনে করেন, খুব কতকগুলি খাইলেই গায়ে জোর হয়, সে খাদ্য হজম হউক্, আর নাই হউক। ফলে তাঁহারা অচিরেই উদরাময় রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন! এও যেন ঠিক সেই প্রকার খাওয়ান। এক গাছের ফল ছিঁড়িয়া আনিয়া, অন্য একটা গাছে ঝুলাইয়া দিলেই কি তাহা শেষোক্ত গাছের রস আহরণ করে? এ সব বিদেশীয় বিজাতীয় ভাষাও তেমনি বাঙ্গলা ভাষার সঙ্গে কখনই খাপ খাইবে না। অথচ সংস্কৃতের অফুরন্ত শব্দকোষে এত বেশী নিজস্ব শব্দ আছে এবং অগণিত ধাতু হইতে সহজে এত বেশী শব্দ-সৃষ্টি করা যাইতে পারে যে, এত শব্দ সাধারণ সাহিত্যিকের জীবনে হয় ত ব্যবহার করার সুযোগই ঘটিয়া উঠিবে না। কিন্তু ইঁহারা ততটা ক্লেশ-স্বীকার করিতে প্রস্তুত যে নহেন, তাহা বুঝাই যাইতেছে! এই জন্য অন্যের দ্বারে ভিক্ষালব্ধ আয়েই ইঁহারা নিজের দৈন্য পূর্ণ করিতে এতটা ব্যস্ত।

এইখানে ইহাদের একটি অদ্ভুত মনোবৃত্তির পরিচয় না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। চল্‌তি কথার প্রচলনে বহু বৈদেশিক শব্দ—যেমন ফার্শী আর্‌বী, এমন কি, ইংরাজী শব্দ পর্য্যন্ত লইতে ইহারা কুণ্ঠিত হন না, কিন্তু ভাষাকে "সংস্কৃত-ঘেঁষা" করিতে নিতান্ত নারাজ! বাঙ্গলা-রচনায় খাঁটি বাঙ্গলা শব্দের অভাবে সংস্কৃত হইতে শব্দ লইতে যে কি ক্ষতি, তাহা আমি বুঝিতে অক্ষম, যদিও সংস্কৃত ভাষা বাঙ্গলারই গর্ভধারিণী। এ জ্ঞাতি-বিদ্বেষের কারণটা কি, জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?

অবশ্য, যে সমস্ত বৈদেশিক শব্দ ইতিপূর্ব্বে আসিয়া পড়িয়াছে এবং বহুদিন বাঙ্গলা-ভাষার আশ্রয়ে বাস করিয়া বাঙ্গলাই হইয়া গিয়াছে, তাহাদিগকে আমি পরিত্যাগ করিতেও বলি না। তাহাদের শুদ্ধি হইয়া গিয়াছে। তাহারা থাকিবেই। বহু সভ্যতার বন্যা এ দেশের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, তাহাদের পলিমাটি যাহা পড়িয়াছে, তাহা ধুইয়া ফেলিবার উপায়ও নাই। মুসলমান সভ্যতার চিহ্ন আছে আর্‌বী, ফার্শী, ও উর্দ্দু কথায়; পর্ত্তুগীজ সভ্যতার নিদর্শন—চাবি, আল্‌মারি, গির্জ্জা, পাদ্রী প্রভৃতি কথায়; এবং ইংরাজী সভ্যতার দানও বহু! এগুলি এতই অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে যে, এখন ইহাদিগকে ছাঁটিয়া ফেলিয়া দেওয়া নিজেরই অঙ্গচ্ছেদ করা। কিন্তু এই সব আসিয়াছে বলিয়া যে অকারণ আরও বহু শব্দ আমদানি করিতে হইবে, তাহারও কোনও কারণ নাই।

এখন দেখা যায় যে, স্থানে অস্থানে ও অকারণে 'ফুল' অর্থে 'গুল্', 'রক্ত' অর্থে 'খুন,' 'উদ্যান' অর্থে 'বাগিচা' 'জল' অর্থে 'পানি' অবাধে ব্যবহৃত হইতেছে! ইহারাও যখন বৈদেশিক শব্দ, তখন যদি কেহ

ইংরাজী শব্দের প্রচুর ব্যবহারে বাঙ্গলা রচনা করেন, তাহা হইলে তাহাতে দোষ কি? এই বিংশ শতাব্দীতে আরবী ফারশী অপেক্ষা ইংরাজীই বেশী লোকে বুঝে। দুই চারিটি ইংরাজী শব্দ ব্যবহার না করে, দেশে এমন লোক বিরল। স্বল্পশিক্ষিত ব্যক্তিও চারিটি শব্দের বাক্য বলিতে তিনটি ইংরাজী শব্দ প্রয়োগ করে! আমরা এখন ইংরাজী সাহিত্য পড়ি, ইংরাজী হইতে অনুবাদ করিয়া লিখি, দুরূহ দুর্ব্বোধ্য ভাব প্রকাশকালে, ব্র্যাকেটের মধ্যে ইংরাজী শব্দটি বসাইয়া, তবে সাধারণের বোধগম্য করিয়া দিই! ইংরাজীতে বক্তৃতা দিই, এমন কি, পিতা, মাতা, স্ত্রীকে পর্য্যন্ত ইংরাজীতে পত্র লিখি!

উচ্চশিক্ষিত বলি তাঁহাকেই—যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ পাইয়াছেন। যদিও তাঁহাদের মধ্যে এমন বহু লোক আছেন, যাঁহারা কি বাঙ্গলা কি ইংরাজী কোনও ভাষাতেই নির্ভুলভাবে একখানি চিঠি পর্য্যন্ত লিখিতে পারেন না! বহু বাঙ্গালীর দোকানে খাতাপত্র পর্য্যন্ত ইংরাজীতে লেখা হয়। বৈষয়িক কাজকর্ম্মের অধিকাংশই ইংরাজীতে সারি, বাঙ্গলা অপেক্ষা ইংরাজীতে দ্রুত লিখিতে পারি এবং তাহাতে মনে করি, সময়ের বহু সংক্ষেপ হয়। এই সব মহাপ্রয়োজনীয় কাজ যদি ইংরাজীতে চলিতে পারে, তাহা হইলে ইংরাজী শব্দের দ্বারা বাঙ্গলা রচনাও চলিবে না কেন?

চল্‌তি কথার প্রচলনে আরও একটি মুস্কিল আছে। কথ্য শব্দের মত শব্দপ্রয়োগ করিতে গেলে এবং প্রাকৃত কি সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গলা ভাষার সম্বন্ধ রহিত করিতে গেলে, বাঙ্গলা ভাষার নূতন করিয়া বর্ণমালা সৃষ্টি করিতে হইবে এবং প্রচলিত শব্দগুলির উচ্চারণমতই বাণানেরও আমূল সংস্কার প্রয়োজন।

বর্ণমালায় বহু অপ্রয়োজনীয় বর্ণ আছে, যেমন "ণ" ও "ন" ; দুইটা "ব" ; "জ" ও "য" ; তিনটা "শ" "ষ" "স" ; "ব"-ফলা "য"-ফলা ; কতক কতক যুক্তশব্দের কথিত উচ্চারণে বিশেষ কোনও পার্থক্যই লক্ষিত হয় না, যেমন ক্ব, ক্য ও ক্ক ; অতএব তিনটির আবশ্যক নাই, যেটা হয় একটা থাকিলেই চলিবে ! "ি" "ী" "ু" "ূ"-কারের উচ্চারণেও কোনই প্রভেদ নাই ; দুইটা "ঋ" দুইটা "ঌ" প্রভৃতিরও বাঙ্গলায় নিশ্চয়ই কোনও দরকার নাই। আর বাণানের যখন বাঁধাধরা কোন নিয়মই থাকিবে না, তখন নিজ নিজ উচ্চারণঅনুযায়ী, যাহার যাহা ইচ্ছা, সে তাহাই লিখিবে ! পৃথিবীর মধ্যে বাঙ্গলা ভাষায় এক অপূর্ব্ব অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার এই হইবে যে, বাঙ্গলা ভাষা বাণান-ভুলের হাত হইতে চিরদিনের মত নিস্কৃতি লাভ করিবে ! বাঙ্গলায় বাণান ভুল আর কিছুতেই কেহ করিতে পারিবে না !! হাজার চেষ্টা করিলেও, না।

আজ এই অতি-আধুনিকগণের রচনার বহু লোক নিন্দা করিতেছে ; কিন্তু এ বিষয়ে ইহাদের পূর্ব্বসূরিগণ কি বিশেষরূপে দায়ী নহেন ?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইঁহাদের এই যে সব বিশ্রী নীরস অশ্লীল রচনা, যাহা নিতান্তই উপেক্ষার জিনিষ, তাহাকে লইয়া এতটা মাতামাতি করিয়াই, আর এক দল লেখক সাহিত্যের সেবার চেয়ে, সাহিত্যের ক্ষতি করিতেছেন বেশী। এই অশ্লীল আবর্জ্জনাগুলিকে অকারণ ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া এমন অযথা ছড়ানো হইতেছে যে, তাহার জন্য এই শেষোক্ত লেখকগণই সম্পূর্ণ দায়ী ! সমালোচনার নামে ইঁহারা উপেক্ষণীয় এই আবর্জ্জনাগুলির বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা প্যারডি এবং তাহাদের অশ্লীল অপাঠ্য অংশগুলি উদ্ধৃত করিয়া নিয়মিতরূপে মাসের পর মাস বাড়ী বাড়ী

পৌঁছাইয়া দিতেছেন। এই সব লেখা বা এই নগণ্য লেখকদের আরও নগণ্য মাসিকপত্রগুলি চিরদিনই লোক-লোচনের অন্তরালে থাকিয়া যাইত, যদি স্বয়ং-নিযুক্ত নির্ব্বোধ এই সাহিত্য-কোতোয়ালগণ ইহাতে হস্তক্ষেপ না করিতেন! ডাষ্টবিনের আবর্জ্জনা ও রাবিশ তখনই রাস্তায় ছড়াইয়া পড়ে, যখন কোনও ষণ্ড বপ্রক্রীড়াচ্ছলে তাহার গায়ে শৃঙ্গ-ঘর্ষণ করে।

সাহিত্য-সমালোচনার নামে ইহাঁরা যে অভদ্র ব্যবহারের পরিচয় দিতেছেন, তাহাতে মনে হয়, ব্যক্তিগত বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া কেবলমাত্র গালি-গালাজ দিয়া গাত্রদাহ নিবারণ করাই ইহাদের প্রথম, প্রবল ও প্রধান উদ্দেশ্য—সাহিত্য-সমালোচনা একটা অজুহাত মাত্র।

তথাকথিত সমালোচনা যাহা বাহির হয়, তাহাতে বিদ্বিষ্ট কোনও একজন লেখকের কোনও একটি লেখাকে উপলক্ষ মাত্র করিয়া, লেখকের ব্যক্তিগত, তাঁহার পরিবারস্থ মহিলাগণের পর্য্যন্ত, এমন কি, আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবদের পর্য্যন্ত পরিবাদ পরিকীর্ত্তিত হয়! আর এ সব রচনায় যে ভাষা ব্যবহৃত হয়, তাহা পূর্ব্বোক্ত অতিআধুনিকগণের ভাষা হইতে বড় বেশী ভদ্রও নয়।

এই সব অনর্থক বাক্-বিতণ্ডার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, যাহাকে ইহারা নির্ব্বাসিত করিতে চাহেন, তাহাকেই প্রকারান্তরে বাঙ্গলার রাজপথে জয়যাত্রা করাইয়া তবে ছাড়িতেছেন। আমার মতে এই নব্য অশ্লীল রচনার এত বহুল প্রচারের জন্য, শেষোক্ত এই ড্রেন-ইনেস্‌পেক্টারগণই মুখ্যত দায়ী!*

* শান্তিপুর সাহিত্য-সম্মিলনীর একাদশ অধিবেশনে পঠিত

মাসিক বসুমতী, আষাঢ় ১৩৩৫

বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের ভবিষ্যৎ

বাঙ্গলা ভাষার ধারা সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা হইতে বহমান। কাজেই তাহার রূপ ধাতু ও ব্যবহার উক্ত পিতৃভাষার অনুগামী হইয়াই চলিয়া আসিয়াছে এবং সেই চলার গতিতেই, এই বর্ত্তমান রূপ ভঙ্গী ও মর্য্যাদা সে পাইয়াছে। তাহাকে আরো সুকর করিবার অভিপ্রায়ে কোনা কোনো পণ্ডিত নাকি এখন এমন মত দিয়াছেন যে, ইহার বর্ণ-পরিবর্ত্তন করিয়া ইহাকে রোম্যান্ বর্ণে পরিণত করা হউক্। ইয়ুরোপে বর্ণ-বৈষম্যে ভীষণ সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু ভারতীয় সুধী, বিশেষত বাঙ্গালী পণ্ডিতেরাও, যে তাঁহাদের মাতৃভাষাকে রোম্যান্ বর্ণে রঙাইতে উদ্যত হইয়াছেন, ইহাতে আমরা তেমন উল্লসিত হইয়া উঠিতে পারিলাম না। তুর্কীস্থানে যাহা সম্ভব, হিন্দুস্থানেও যে তাহাই চলিবে, এ উক্তির মূলে কোনো যুক্তি আছে বলিয়াও মনে হয় না। তুর্কীস্থানের অনুকরণে তুর্কীনাচন চলিতে পারে, বাঙ্গলা ভাবার কোনও উন্নতিসাধন তদ্দারা হইবে না।

ইঁহারা বলেন, রোম্যান্ হরফে বাঙ্গলা ভাষা লিখিলে, লেখা টাইপ-করা বা ছাপা খুব সুকর হইবে, বাঙ্গলা ও ইংরাজী ছাপায় দুই রকমের টাইপের প্রয়োজন হইবে না, বাঙ্গালী অবাঙ্গালী সকলেই সমান বাঙ্গলা পড়িতে পারিবে, এবং এইরূপ আরও বহু সুবিধাও হয়ত হইতে পারে! কিন্তু ইংরাজী হরফে বাঙ্গলা রচনার প্রস্তাবরূপ গো-রচনা আমাদের হাস্যরসেরই উদ্রেক করিতেছে সমধিক, যেমন, হ্যাট-কোট-টাই

পরিয়া সাহেব সাজিয়া আমাদের খাঁটি ভারতসন্তানেরা "সাহেব" নামে অভিহিত হইতে লালায়িত !

যে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মহাশয় উক্ত প্রস্তাব করিয়াছেন, তিনি যদি বলিতেন যে, বাঙ্গালী বাঙ্গলা ভাষা পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজী, হিব্রু, গ্রীক, জার্ম্মান্, ফরাসী, ফার্শী বা ঐরূপ কোনও একটি ভাষাকে মাতৃ-ভাষারূপে গ্রহণ করিয়া, বঙ্গসরস্বতীকে বঙ্গোপসাগরের অতল তলে বিসর্জ্জন দিতে, তাহা হইলেও বোধ হয় তাঁহার চিন্তাশীলতার কতকটা পরিচয় পাইয়া, এই বয়সেও নবীন উদ্যমে তাঁহার প্রস্তাবটিকে কার্য্যে পরিণত করিতে এবং করাইতে কিছু চেষ্টাও করিতে পারিতাম, এবং সে চেষ্টা রোম্যান হরফে বাঙ্গলা-লিখনের অপেক্ষা ঢের বেশী সহজ-সাধ্যও হইত। কিন্তু তিনি চাহেন, ফতুয়াকে ওভারকোটে রূপান্তরিত করিয়া ফতুয়া নামেই অভিহিত করিতে ! রোম্যান অক্ষরে বাঙ্গলা ভাষা আর হাফ্-প্যাণ্ট্ ও হাফ্-শার্ট পরিহিতা বাঙ্গালী মেয়ে, একই রকম নয়নমনোহর নয় কি ?

বাঙ্গলা ভাষায় লাইনো-টাইপ হইয়াছে, টাইপরাইটার কলও আসিয়াছে, তাহাতে বহু যুক্তাক্ষর ও একক অক্ষরও বাদ দেওয়া হইয়াছে, কারণ তাহা না করিলে লাইনো হয় না, টাইপ-রাইটারও জন্মে না। আমরা বুঝিতে পারিতেছি না, অর্দ্ধেক অক্ষর বাদ দিয়া অক্ষরের মূর্ত্তি বদ্‌লাইয়া যদি উক্ত দুই পদার্থ হইতে পারে, তবে সমগ্রটি অক্ষত অব্যয় রাখিয়াই বা হইবে না কেন ? উদ্ভাবকগণ বলিবেন, বাঙ্গলায় অক্ষর সংখ্যা অনেক বেশী, সেজন্য কিছু বাদ না দিলে যন্ত্র দুইটি সহজ-ব্যবহার্য্য হইবে না ! সহজ-ব্যবহার্য্য হইবে না কে বলিল ? আর যদি না-ই হয়, তাহা

হইলে উদ্ভাবকগণ সেই চিন্তাই করুন, যাহাতে তাহা হয়। যদি একান্ত তাঁহাদের বিদ্যায় না কুলায়, বাঙ্গলায় লাইনো বা টাইপরাইটার না-ই হয়, না-ই হইল! তাহাতেই বা এমন বিশেষ কি অসুবিধা হইবে? জুতা পায়ে দিলে আরামও হয়, বিলাসও হয়ঃ কিন্তু জুতা যদি পায়ে ছোট হয়, তাহা হইলে কি পা-টা কাটিয়া ছোট করিয়া, জুতায় প্রবেশযোগ্য করিতে হইবে? পায়ের মাপেই সর্ব্বত্র জুতা হয়, কিন্তু বাংলার পণ্ডিতেরা বলিতেছেন, মুচিদের অসুবিধা নিবারণার্থে জুতার মাপেই পা করিতে হইবে, না হয় পা কাটিয়া ফেল। পা নাই থাকুক, জুতা চাই!

ইংরাজীই কি একদিনে এমন সহজ হইয়া উঠিয়াছে? এখনও গবেষণা চলিতেছে, আরও সুকর কি করিয়া করা যায়? বাঙ্গলার বেলাতেই বা তাহার ব্যতিক্রম কেন হয়? এখন না হয় একটু কষ্টসাধ্যই হইল, তাহার পর ক্রমশ এ জিনিষের উন্নতি হইবে। কোনও যন্ত্রের উন্নতি কখনও একদিনে বা একজনের দ্বারা হয় না, হয়ও নাই। সম্পূর্ণ ও সমগ্রভাবে করিয়া উন্নতি ও সংস্কারের ভার ভবিষ্যৎ বংশীয়দের হাতে ছাড়িয়া দিলেই, ইঁহারা ভাল করিতেন। কিন্তু এ সব কাজের সমস্ত প্রশংসাটুকু নিজেরাই লইবেন বলিয়া, ইঁহারা বলিলেন, ছোট বাড়ী দিব, আত্মীয় স্বজন পুত্রকন্যাদিগকে তাড়াইয়া দাও,-কিম্বা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ কর, সুখে বসবাস করিতে পারিবে !! বেওয়ারিশ বাংলা ভাষা! যাঁহার যাহা ইচ্ছা, তিনি তাহাই করিতে প্রয়াসী হইতেছেন।

সাহিত্যক্ষেত্রেও এমনি ধাপ্পা চলিতেছে। সস্তায় কিস্তি মারিবার এবং যে কোনও ফিকিরে ছাপার হরপে নিজের নাম দেখিবার দুরন্ত প্রলোভনের

জলোচ্ছাসে, বর্ত্তমান যুগের তরুণ লেখকলেখিকাগণ অনিশ্চিত স্রোতে ভাসমান। প্রতিদিন বহু নবীন লেখকের বহু রচনার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে, কিন্তু তাহার মধ্যে শতকরা যদি একটিও সত্যকার ভাল প্রকাশযোগ্য লেখা পাওয়া যাইত, তাহা হইলে আমরা পুলকিত হইতাম—কিন্তু সে সৌভাগ্যও আমাদের বড় ঘটে না। ক্বচিৎ দুই-একটি লেখকের সন্ধান পাওয়া যায়, কিন্তু যোগ্য অনুশীলনের অভাবে অত্যল্প কালের মধ্যেই তাঁহারাও এমন অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়া পড়েন যে, তাঁহাদের লেখা ক্রমশ একেবারে অপাঠ্য হইয়া পড়ে।

প্রত্যেক লেখকের রীতিমত পাঠাভ্যাস ও অনুশীলনের প্রয়োজন, কিন্তু কয়জন নবীন লেখক তাহা করেন? লেখা দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায় যে, লেখাটি কোনও পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকের চুরি বা ভাবে অনুপ্রাণিত। লেখ্য বিষয়ের সহিত লেখকের সম্যক পরিচয় ঘটা দূরে থাকুক, সে বস্তুর সম্বন্ধে তাঁহার ধারণাও তেমন স্পষ্ট নয়। যেমন, আজকাল শতকরা একশত জন তরুণ লেখকই প্রেমের কবিতা ও গল্প লিখিয়া থাকেন, কিন্তু প্রেমের বা নরনারীর আকর্ষণ বিষয়ে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা কতটুকু? লেখা লেখকের মনের ছায়া, অভিজ্ঞতা তাঁহার শক্তির উত্তরসাধক। আর এ অভিজ্ঞতা হয় পাঠে, অনুশীলনে, সামাজিক মেলামেশায়, মানব চরিত্রের পর্য্যবেক্ষণে এবং সর্ব্বোপরি নিজের জীবনের উপলব্ধিতে, আয়ুষ্কালের অন্তিম মুহূর্ত্ত অবধি। সাধারণ লেখকেরা লিখিতে শেখেন, কাজেই তাঁহাদের সাধনার প্রয়োজন, কিন্তু যাঁহারা ক্ষণজন্মা প্রতিভাধর তাঁহারা সে শক্তি লইয়াই জন্মগ্রহণ করেন এবং উত্তরোত্তর তাঁহাদের সে শক্তি অনুশীলনে ও অভিজ্ঞতায় দিন দিন শতদলে বিকসিত হইয়া উঠে।

বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি যুগ-মানবগণ শক্তি লইয়াই জন্মেন, আমাদের মত মক্স করেন না।

এই যদি বাঙ্গলা সাহিত্যের অনাগত সবকদিগের নমুনা হয়, তাহা হইলে বাঙ্গলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও আশঙ্কিত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে, স্বীকার করিতেই হইবে।

বাঙ্গলা সাহিত্যকে কেন্দ্র করিয়া রঙ্গমঞ্চ ও চিত্রশিল্প গড়িয়া উঠা উচিত, যেমন অন্যান্য সব দেশে হইতেছে, কিন্তু আমাদের এই দুর্ভাগ্য দেশে, এখানেও বাঙ্গলা সাহিত্য বা সাহিত্যিকের ভবিষ্যৎ মোটেই আশাপ্রদ নয়।

অভিনয় ও অভিনেতৃসজ্ঘ যত ভালই হউক্ না কেন, মূলবস্তু নাটক : নাটক যদি না ভাল হয়, তাহা হইলে সবই যে পণ্ডশ্রম হয়, তাহার দৃষ্টান্ত আমাদের পট ও চিত্র-জগতে নিত্য দেখা যাইতেছে। মঞ্চের এবং পটের বিন্যাস-কৌশল সম্পূর্ণ বিভিন্ন বলিয়া, মঞ্চের সুনাটকও পটের পরিপন্থী। পটে গল্প বলিবার ভঙ্গী স্বতন্ত্র বলিয়া, পটোপযোগী গল্প-রচনা ও চিত্রনাট্যও সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। ধরণটা অন্য বলিয়া, কথা-রচনা ত অন্য নয়! একটি গল্পের যেমন মঞ্চ-নাট্য হয়, পটের জন্যও তেমনি সে কাহিনীর চিত্র-নাট্য রচিত হয়। মূল বিষয়বস্তু, গল্প।

ইয়ূরোপে ও আমেরিকায় চিত্রের গল্পের জন্য সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস গৃহীত হয়, ভাল ভাল নাম-করা গল্পলেখকদিগকে ষ্টুডিওতে গল্পরচনা অথবা গল্প-নির্ব্বাচনের জন্য নিযুক্ত করা হয়, কিন্তু আমাদের দেশে সবই যেমন বিপরীত, এ ব্যাপারেও তেমনি স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। এখানকার কোনও ষ্টুডিওতে কোনও গল্পলেখক আছেন বলিয়া অদ্যাবধি শুনি নাই।

সাধারণত ভারতীয় পট-চিত্রের গল্পলেখক হন, হয় স্বত্বাধিকারী নিজেই, নয়, তাঁহার কোনও আশ্রিত, কিম্বা সর্ব্বশক্তিমান্ পরিচালক !!

ভারতীয় পরিচালককে সর্ব্বশক্তিমান্ বলিতেছি এই কারণে যে, তিনি একাধারে সর্ব্বগুণসম্পন্ন অভ্রান্ত এবং সবজান্তা !! কাজেই, কাহারও লেখা তাঁহার পছন্দ হয় না ! তিনি উন্নাসিক হইয়া গম্ভীরভাবে বলেন, হাঁ অমুকের লেখা ভাল, তবে ফিল্ম-ষ্টোরি লিখিতে জানে না। অবশ্য ফিল্ম-ষ্টুডিওতে ডিরেক্টারের মতে প্রোপ্রাইটারকেও মুখবন্ধ করিতে হয়, কারণ সেই ভাগ্যবান্ (?) ব্যক্তির হাতেই ছবির প্রাণ ! অতএব পরিচালক স্বয়ংই পট-গল্পের ভাগ্যবিধাতা হইয়া বসেন !

যিনি পরিচালক তিনি যদি শুধু পরিচালনাতেই মস্তিষ্ক ব্যয় করেন এবং ঈদৃশ অনধিকারচর্চ্চায় বিশেষ ব্যাপৃত না হন্, তাহা হইলে ভারতীয় পটচিত্রের ভবিষ্যৎ ভালই হয় ! কিন্তু আমাদের দেশের লোকের অভ্যাসই হইতেছে, কোদাল ভাঙ্গিয়া করতাল গড়ান'। যিনি যাহা পারেন না, তাহাই করিতে তিনি প্রাণপণ। কোনও পরিচালক সাজিবেন নায়ক, কোনও পরিচালক সাজিবেন গল্পলেখক—ফলে কাহারও কোনোটাই আশানুরূপ সাফল্য লাভ করে না। পরিচালকের থাকিবে গল্পলেখকের দৃষ্টিভঙ্গী ও পটে চরিত্র-সৃজনী ক্ষমতা—সঙ্গে সঙ্গে চিত্রনির্ম্মাণ যন্ত্রাবলীর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়। অভিনয়-কলাতেও তাঁহার দক্ষ হওয়া চাই। কিন্তু জীবনে যিনি কোনও দিন কোনও লেখা লিখিলেন না, কিম্বা সাহিত্য চর্চ্চাও করিলেন না, হঠাৎ তিনি যদি পরিচালনার ভার পাইয়াই গল্প-লেখক হইয়া বসেন, তাহা হইলে তাহার যাহা অবশ্যম্ভাবী ফল, তাহা ভারতীয় চিত্রে বিশেষত বাঙ্গলাচিত্রে খুব ভাল করিয়াই ফলিতেছে।

দেখা গিয়াছে, বিখ্যাত লেখকের গল্প পরিচালনার শত ত্রুটিতেও যেরূপ জনপ্রিয় এবং অর্থপ্রদ হয়, অখ্যাত লেখকের গল্প সুপরিচালনাতেও তাহার অর্দ্ধেকও দিতে সক্ষম হয় না। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক দুইজনেই সস্তায় কিস্তি মারিতে যান বটে, কিন্তু ঠকেন তাঁহারই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

কাজেই বাঙ্গলা সাহিত্য এবং যাঁহারা প্রকৃত সাহিত্যিক, তাঁহারা কেহই এই শিল্পের সহিত তেমন ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট নহেন। সাহিত্যের কারবার করিব অথচ সাহিত্য লইব না, এ ধরণের মনোবৃত্তি এই দেশেই একমাত্র সম্ভব। মিষ্টান্নের প্রয়োজন, অথচ ময়রার সাহায্য ইহারা লইবেন না! কবির কথায়, গভীর হতাশার সহিতই বলিতে হয়—

এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি
সে যে আমার বঙ্গভূমি!

দীপালী, ৭ই কার্ত্তিক, ১৩৪২

আমাদের সাহিত্য-সাধনার প্রথমাবস্থা

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে সাহিত্যসেবায় প্রথম আমরা যখন ব্রতী হইয়াছিলাম, তখনকার এবং এখনকার সময়ের মধ্যে সরিৎসাগরভূধর-পারান্তরের মত একটা অপরিমেয় ব্যবধান হইয়া গিয়াছে। আধুনিক সাহিত্যসেবিগণের পুরাকালের সে পরিবেশ সম্বন্ধে কোনও ধারণা নাই, থাকা সম্ভবও নয়; কারণ যে-সময়ের কথা আমি বলিতেছি, বর্ত্তমানের শতকরা পঞ্চাশ জন সাহিত্যিক হয়ত তখন ভূমিষ্ঠই হন্ নাই। কাজেই, রবীন্দ্রনাথের অব্যবহিত পর-যুগের সাহিত্যিক পারিপার্শ্বিকতার কথা কিছু বলিলে, বোধ হয়, অসাময়িক হইবে না।

রবীন্দ্রনাথের সৃজনী প্রতিভা ও নিত্য নব নব রস-পরিবেশনের সংবাদ তখন বাংলাদেশের মুষ্টিমেয় ক্ষুদ্র এক গণ্ডীতে আবদ্ধ ছিল। হেমচন্দ্র, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্ত, টেকচাঁদ ঠাকুর ভারতচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, সুরেশ সমাজপতি, চন্দ্রনাথ বসু, রজনীকান্ত সেন, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, বীরবল, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, দেবেন্দ্রনাথ সেন, দীনবন্ধু মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথনাথ রায় চৌধুরী, নবীনচন্দ্র সেন, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় এবং আরও ২।৪ জন ছিলেন তদানীন্তন বাঙ্গলা সাহিত্যে নাম-করা ও যশস্বী। তৎকালীন বাংলা সাহিত্য বলিতে এই কয়জনের রচনা, বৈষ্ণব-সাহিত্য এবং মহাজনপদাবলীই বুঝাইত। বাংলা সাহিত্যমন্দিরপথের পাথেয় আমরা তখন এই সব

রচনা হইতেই সংগ্রহ করিতাম। ইঁহাদের রচনারই অনুশীলন করিতাম এবং ইঁহাদিগকেই সাহিত্যসেবার অগ্রণী করিয়া, আমরা সাহিত্য-সাধনার দুস্তর পথে অগ্রসর হইয়াছিলাম।

বঙ্গমহিলাদের মধ্যে তখন সুপ্রসিদ্ধা ছিলেন, কামিনী রায়, স্বর্ণকুমারী দেবী, সরলা দেবী, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ও সরোজকুমারী দেবী প্রভৃতি। বাংলা গানে ছিলেন নিধুবাবু, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, মতি রায়, নীলকণ্ঠ প্রভৃতি। ১৯০৫ সালের পর স্বদেশী গানের প্রচলন হওয়ায় কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, প্রমথনাথ রায় চৌধুরী, রজনীকান্ত দ্বিজেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রনাথ গীতিকাররূপে জনসাধারণে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সঙ্গীত ও প্রেমসঙ্গীত তখনকার তরুণদের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত থাকিলেও, প্রৌঢ়দের মধ্যে তিনি ছিলেন একেবারেই অচল।

তখন থিয়েটার ছিল একমাত্র কলিকাতাতেই, পরে বর্দ্ধমানেও দুইটি স্থায়ী সাধারণ থিয়েটার হইয়াছিল কিন্তু বেশী দিন সে দুটি স্থায়ী হয় নাই। কলিকাতায় থিয়েটার থাকা সত্ত্বেও, মফঃস্বলে যাত্রারই আদর ছিল সমধিক। সে-কালের বিখ্যাত যাত্রাসম্প্রদায় ছিল, মতি রায়ের, নীলকণ্ঠের ও ভূষণ অধিকারীর। সিনেমা তখন কল্পনার অতীত।

বাংলা দৈনিক তখন ছিলই না। সাপ্তাহিক ছিল—হিতবাদী, বসুমতী, বঙ্গবাসী, সঞ্জীবনী, সুলভ সমাচার এবং আরও হয়ত ২।১ খানি আজ যাহার অস্তিত্বও নাই, নামও ভুলিয়া গিয়াছি। সাপ্তাহিকগুলিতে তখন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাহিত্যিক প্রবন্ধাবলী নিয়মিত প্রকাশিত হইত। একমাত্র সাহিত্যসম্বন্ধীয় পত্র বলিতে ছিল, কলিকাতায় বসুধা, অবসর, নব্যভারত,

সাহিত্য, ভারতী, বঙ্গদর্শন, সাহিত্যপরিষৎপত্রিকা, প্রদীপ, এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত প্রবাসী ও ঢাকা হইতে প্রকাশিত বান্ধব; দ্বৈমাসিক, ত্রৈমাসিক, বা দ্বি-সাপ্তাহিক তখনও জন্মগ্রহণ করে নাই।

রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন 'ভাণ্ডার' নামে একখানি মাসিক পত্র সম্পাদনা করিয়াছিলেন, কিন্তু সেখানিও বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শন সম্পাদনা ছাড়িলে, শৈলেশচন্দ্র মজুমদার বঙ্গদর্শনের কর্ণধার হইয়াছিলেন। এই সময় হইতে ক্রমশ দুই-একখানি করিয়া মাসিক পত্র বাড়িতে লাগিল। ভাল কাগজে ভাল ছাপায় সুচারু অঙ্গসৌষ্ঠবে সাহিত্যপ্রধান সাপ্তাহিক, "মর্ম্মবাণী"ই বর্ত্তমান সাপ্তাহিক পত্রগুলির পথপ্রদর্শক।

যে-সময়ের কথা বলিতেছি, তখন ছাত্রজীবনে সঙ্গীত বা নৃত্যচর্চ্চা অকথ্য কদভ্যাসের মত নিষিদ্ধ ছিল। আমরা সঙ্গীতচর্চ্চা করিতাম, জন-বিরল গঙ্গার ধারে, মাঠে, অথবা মেসে বোর্ডিংএ, বিশেষ সতর্কভাবে এবং চতুর্দ্দিক দেখিয়া শুনিয়া, পাছে কোনও অভিভাবক বা তদীয় বন্ধুর কিম্বা বয়োজ্যেষ্ঠ কোনো পরিচিত ব্যক্তির কর্ণগোচর হয়। বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, ১৮।২০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আমরা ট্রামে বা জনবহুল পথে কখনও সিগারেট খাইতেও সাহসী হই নাই, পাছে কোনও বয়োজ্যেষ্ঠ বা অভিভাবক-বন্ধুর নজরে পড়ি। এখন অজাতশ্মশ্রুগুম্ফ বালক ট্রামে বাসে অকুতোভয়ে ধূমপান করিয়া, পার্শ্বোপবিষ্ট বৃদ্ধের দুগ্ধধবল কেশশ্মশ্রুকে ধূমাচ্ছন্ন করিতেও এতটুকু দ্বিধা বোধ করে না!!

আমাদের যে সব আড্ডা বসিত, সাহিত্য-চর্চ্চাই ছিল তাহাদের প্রধান অঙ্গ। কোন্ কাগজে কে কি লিখিয়াছে, তাহার আলোচনা, স্বমতের

অনুমোদন, বিপক্ষ মতের সহিত তর্ক ও বিতণ্ডা, এমন কি হাতাহাতির উপক্রম পর্য্যন্তও ঘটিয়া উঠিত। দিবারাত্রি রচনা-চিন্তা ও অনুশীলন। অনুকরণের স্পৃহাও এই রচনাচিন্তার মধ্যে বড় কম থাকিত না; তবে তাহাতে নীচতা থাকিত না, থাকিত ভাবের চুরি, অর্থাৎ লেপের তুলা চুরি করিয়া বালাপোষ-তৈরীর প্রচেষ্টা।

তৎকালীন বড় বড় নামকরা সাহিত্যিকদিগকে পত্র লিখিতাম, স্নেহভরা এবং উপদেশপূর্ণ উত্তরও পাইতাম, বুকে ভরসা হইত। চোখে না দেখিলেও, রচনা এবং পত্রের মধ্য দিয়াই পরস্পর একটি নিবিড় মধুর সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিত! এমনি করিয়া সাহিত্য-সাধনার প্রথমাবস্থায় আমরা অধুনাস্বর্গগত বহু সাহিত্যিকের স্নেহলাভে ধন্য হইয়াছিলাম।

সাহিত্য সাহিত্যিকের জীবনের দর্পণ। সাহিত্যিক নিজের জীবনে যাহা উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহার রচনায় তাহাই ফুটিয়া উঠে বিচিত্র ভঙ্গীতে, নানা ব্যঞ্জনায় ও বহুধা লীলায়। জীবনে যাহার সঞ্চিত ধন কিছুই নাই, তাহার দিবারও বিশেষ কিছু থাকে না।

দীপালী, ২রা মাঘ, ১৩৪২

বঙ্কিমচন্দ্র ও যুগ-সাহিত্য

কাপড়ে ও সেই-কাপড়ে-তৈরি জামায় যে প্রভেদ, রচনায় ও সাহিত্যে সেই রকম তফাৎ। রচনা অনুশীলন-সাপেক্ষ, সাহিত্য-রচনা সহজাতশক্তি অনুবেক্ষণ ও অনুভূতির ফল। স্কুলকলেজের ছেলেমেয়েরা যে রচনা করে, তাহা রচনা-মাত্র—তাহাকে সাহিত্য কেহই বলে না, যদিও সাহিত্য-সৃষ্টি করিতে হইলে রচনায় সুপক্ক হইতেই হয়। কাজেই, গোটা কয়েক কথা একত্র করিয়া লিখিলেই তাহা সাহিত্য হয় না, কারণ সব রচনাই সাহিত্য নয়। যাহা সাহিত্য নয়, তাহা প্রকাশ-যোগ্যও নয়, কেন না রচনা-প্রকাশের উদ্দেশ্য—সাধারণকে আনন্দ-লোকের সন্ধানদান। যে-রচনা আনন্দ দিতে অসমর্থ, সেটি যত ভাল রচনাই হউক না কেন, তাহা সাহিত্য নয় বলিয়া, প্রকাশযোগ্যও নয়। সাহিত্যরচনায় চাই বিচিত্র চরিত্রের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়, মানব-জীবনের বহুধা-বিভিন্ন বিষয়ে প্রত্যক্ষ সচেতন অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি এবং জাতীয় ও সামাজিক জীবনের প্রত্যেক পর্য্যায় ও স্তরের সহিত সাহিত্যিকের আন্তরিক সংযোগ। বস্তুর সম্যক জ্ঞান চাই, কিন্তু রচনা হইবে বস্তুর অতীত। এই যে বস্তুর অতীত দৃষ্টি ও অনুভূতি, এইটিই রচনার সোণার কাঠি। ইহার মায়াস্পর্শেই লোহার রচনা সোণার সাহিত্য হয়: এবং সুদূরদৃষ্টির আলোকসম্পাতে, সে-সাহিত্য হয় অনাগতগণেরও প্রিয়! সাহিত্য শুধু রচনা নয়, সৃষ্টি।

সাহিত্য অমর, কারণ সে বস্তুর অতীত, অনুভূতি ও দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। যে-সাহিত্য কেবলমাত্র বস্তুর উপর প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, পাদ-পীঠের ধ্বংসের সহিত পীঠোপবিষ্ট সে-সাহিত্যের মৃত্যুও সুনিশ্চিত। কালিদাস, শেক্সপীয়ার, ভিক্টর হুগো হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র পর্য্যন্ত মনীষিগণের সাহিত্য আলোচনা করিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হয়, ইঁহাদের রচিত সাহিত্যের অমরত্বের মূল কি এবং কোথায়। ধরুন্ কালিদাস। মহাভারতের ইতিহাসোক্ত রাজা দুষ্মন্ত ও কণ্বতনয়া শকুন্তলার প্রেম-কাহিনী। ইতিহাসকার লিখিয়া গিয়াছেন—ইঁহাদের বিবাহ মিলন ও স্বর্গারোহণ, যেমন নিত্য লক্ষ লক্ষ নর-নারীর হইতেছে। ঘটনা অতি-সাধারণ। কবি কালিদাসের প্রতিভা সৃষ্টি করিল, সাধারণ নশ্বর দুষ্মন্ত-শকুন্তলার দেহাতীত রূপ এবং মনসাতীত অকল্পিত, হয় ত অসংঘটিত অথবা এমন-না-ঘটিয়া-থাকিতেও-পারে ঘটনার উপর এক বিরাট মৃত্যু-হীন প্রেমকাহিনী, যাহা যুগে যুগে জনে জনে দেশে দেশে নর-নারীর অন্তরে শুদ্ধ আনন্দের দোললীলা করিয়া আজিও ফিরিতেছে। এই আনন্দ-পরিবেশনের অশ্রান্ত ধারাই কালিদাসের অমরতা সপ্রমাণ করিতেছে। কবেকার কোথাকার পরিচয়হীন গোত্রহীন কবি কালিদাস, পরিচয়-গোত্রাতীত হইয়াও আজ তাই অমর।

সার্ব্বকালিক ও সার্ব্বজনীন সাহিত্য জগতে বড় বেশী নাই, কারণ যুগধর্ম্মের চাপে স্রষ্টা অনেক সময় আপনার অজ্ঞাতসারেই যুগসাহিত্য রচনা করিয়া ফেলেন। এ সাহিত্যকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ফেলিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না। অবশ্য, জাতীয় জীবনে এবং জাতির ইতিহাসরচনায় এ প্রকার যুগসাহিত্যেরও বিশেষ প্রয়োজন আছে।

শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণবধর্ম্মে সমস্ত বাঙ্গলা দেশ যখন নূতনভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সময় বাঙ্গলা দেশের "গৌরমণ্ডলভূমি"তে শত শত কবি এই বৈষ্ণবভাবে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া যে পদাবলীর মন্দাকিনীলহরী ছুটাইয়া গিয়াছেন, আজও তাহা যেমন সবেগে প্রবাহিত, তেমনি তৎকালীন বাঙ্গালী ভাবধারার প্রতিচ্ছবিরূপেও মহিমাময়।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যলোকেও আমরা তেমনি পাই গতপ্রায় যুগের মহিমা এবং নবযুগের রক্তিমালোকে অরুণ-উষার বিজয়-তূর্য্য। অতীত মানব চন্দ্রশেখরের সঙ্গে নবীন দিনের কুন্দ, দেবেন্দ্র দত্ত, হীরা এমন কি প্রসন্ন গোয়ালিনী, গৌরদাস বাবাজীর পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ পাই। "আনন্দমঠ" আধুনিক যুগের কল্পনা। "বন্দেমাতরম্" আধুনিক দেশ-জননীর ধ্যান।

বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেই প্রথম বাংলা সাহিত্যে ইংরাজী সভ্যতার ছাপ পড়িল। দেশবাসীর অভাব-অভিযোগ, সুখ-সন্তোষ, আশা-ভরসা, কল্পনা ধর্ম্ম প্রভৃতিকে কেন্দ্র করিয়া যে চিন্তা ও ভাবধারা অস্পষ্টভাবে তৎকালীন লোকের মনে জোনাকির মত মৃদু মৃদু জ্বলিতেছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা-সূর্য্যের প্রখর রৌদ্রপাতে সেগুলি হইয়া উঠিল জাগ্রৎ ও তীব্র। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য সেইজন্য যুগসাহিত্য হইয়াও বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাসে অমর।

বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেই রাজনীতিকে কেন্দ্র করিয়াও এক নবীন সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে। এ সাহিত্যে আমরা প্রথম অনুভব করিলাম, পরাধীন নিরস্ত্র নিঃসহায় জাতির অভাব অভিযোগ, বেদনা ও আকাঙ্ক্ষা। বঙ্কিমচন্দ্রের এই সাহিত্যই প্রকৃতপক্ষে যুগসাহিত্য। তথাপি ইহার ভিতর অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত এমন একটা চিরন্তন সার্ব্বভৌম

সার্ব্বজনীন আবেদন প্রবাহিত, যাহা অনাগত কোনো কালে, সমবস্থ অন্য দেশীয় অপর কোনও জাতির হৃদয়তন্ত্রীতেও এমনিই আঘাত করিবে। এইখানেই সাহিত্য আর তাহার সার্থকতা।

বৈষ্ণব পদাবলীতে লোকোত্তর রাধাকৃষ্ণের প্রেম। সমস্ত মহাজনই এই প্রেমের ব্যাসাত করিয়া গিয়াছেন। দেবতার প্রেমে নিজের কল্পনা ও আকাঙ্ক্ষা মিশাইয়া আমরা সেই সব প্রেমকাহিনীর রসগ্রহণ করি এবং চিরদিনই করিব, কারণ এ প্রেমলোকে ধ্বংসশীল কায়া নাই, আছে শুধু কায়াতীত ভালবাসা। মহাজনগণ বস্তুর অতীত পদার্থকে ধরিতে গিয়া ধরিয়াছেন মহামানবকে, মানবকে নয়। কারণ, তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন মানবের ভালবাসা মানবের দেহের মতই নশ্বর, দেহের বিনাশের সঙ্গেই তাহারও অবলোপ। ভগবানের মৃত্যু নাই, ক্ষয় নাই, তাই বোধ হয় তাঁহার প্রেমেরও ক্ষয় নাই, লয় নাই।

আমার মনে হয়, মহাজনগণ মানুষকে এইখানে বড় ছোট করিয়া গিয়াছেন। মানুষের সত্য তপ্ত ভালবাসাকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা গাহিয়া গেলেন কিনা কল্পিত প্রণয়ের অসম্ভব জয়গান। যে কবির বিপুল প্রতিভায় কল্পিত প্রেম এমন লোকরমণীয় হইয়া উঠে, তাঁহারা যদি মানবের প্রেমকে এতটুকু সম্মান করিতেন, তাহা হইলে সমগ্র জগতবাসীর অন্তরে সেটি আজ কী আনন্দলোকের সন্ধানই না আনিয়া দিত।

বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম বাঙ্গালী নরনারীকে লইয়া তাহাদের পারিবারিক, সামাজিক ও সাংসারিক সুখ-দুঃখের কাহিনী লিখিয়া, বাংলার কথা-সাহিত্যের রাজতোরণ উন্মুক্ত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। নিজে বৈষ্ণব

হইয়াও বৈষ্ণব-মহাজনগণের পদাঙ্ক অনুসরণ না করিয়া, তিনি স্বীয় অলৌকিক প্রতিভাবলে নূতন পথের যাত্রী হইয়াছিলেন। সেদিন যে পথে তিনি ছিলেন একা পথিক, আজ সেই পথে অগণিত যাত্রী। বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যের প্রবর্ত্তক হিসাবে শুধু নয়, বঙ্কিমচন্দ্র বর্ত্তমান যুগের গুরুরূপেও অমর।

দীপালী, ৯ই মাঘ, ১৩৪২

সাহিত্যের উপাদান

অনেকের ধারণা, সাহিত্যের উপাদান সংগৃহীত হয় বাহিরের বস্তু হইতে। কাজেই, রচনা করিতে চাই—চন্দ্রালোকিত স্তব্ধ নিদ্রাতুর তটিনী-সৈকত, কুসুমসুরভিমেদুর চঞ্চল দক্ষিণানিল, যৌবনসমারোহমুখর প্রোজ্জ্বলা সুন্দরী আর তরঙ্গায়িত সুরসুরভিসুরার মদিরহিল্লোল। এই সব ইন্দ্রিয়-মোহন উপকরণসম্ভারে নাকি মানবের কাব্যরসবোধ জাগ্রৎ হইয়া, লেখনীর মুখে স্বতস্ফূর্ত্ত গোমুখীধারার মত কাব্যরসধারা শতধারে উছলিয়া উঠে!

জ্যোৎস্না ফুল মলয়ানিল প্রভৃতির সৌন্দর্য্য মানবের সুপ্ত সৌন্দর্য্যবোধকে উদ্বুদ্ধ করিতে সহায়তা করে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহারা কাব্যের একমাত্র উপাদান নয়। কেবল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিলেই কবি হওয়া যায় না,সে সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে কবির মন চাই, এবং সে সৌন্দর্য্য দেখিতে কবির অন্তর্দৃষ্টি চাই, চর্ম্মচক্ষুর দৃষ্টিতে কোনও ফল হয় না। ডাল, ভাত, তরকারী প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য, জীবনরক্ষার্থে অবশ্য প্রয়োজনীয়; কিন্তু ডাল, ভাত, তরকারীই জীবন নয়। খাদ্য বস্তুর অন্তর্নিহিত রস বিন্দু-বিন্দু করিয়া আমাদের শরীরযন্ত্রাবলীর কেন্দ্র হইতে কেন্দ্রান্তরে গিয়া, জীবনের মূলে যেমন শক্তি সঞ্চার করে, বাহিরের এই সব উপকরণও তেমনি কবির মনে কাব্যরসবোধের ভাণ্ডারে অণু অণু করিয়া জমিয়া, কবির রসবোধকে শক্তিশালী ও অনুভূতিকে প্রকাশক্ষম করিয়া তোলে। ধরণীর অবহেলিত মৃত্তিকাস্তূপ কুম্ভকারের চক্রে নয়নমনোহর পুত্তলিকা ও

প্রয়োজনীয় পাত্রে যখন পরিণত হয়, তখন সে আর পদদলিত মাটি থাকে না, একটি রূপের প্রতীকে পরিণত হয়।

ধরণীর রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শ কবির মানসলোকে যখন গিয়া পৌছায়, তখন তাহারা হইয়া উঠে অতীন্দ্রিয়। কবি সৌন্দর্য্যের পূজারী, অনাগতের ঘটক, বিশ্বজনের মিতা। তাহার অন্তরলোকেই সত্য শিব সুন্দরের সুবর্ণ দেউল। কবির কল্পনা স্পর্শমণি; ইহার স্পর্শে লোহা সোণা হয়, কুৎসিত সুন্দর হয়, এক বহু হয়, সান্ত অনন্ত হয়, স্থূল সূক্ষ্ম হয় এবং মৃত অমৃত হয়।

প্রকৃতির মধ্যে অপ্রাকৃতের সন্ধান, রূপের ভিতর রূপাতীত অরূপের যে মূর্ত্তি, সীমার মধ্যে অসীমের যে আবেদন—তাহাই করে কাব্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা। কাব্যের এই প্রাণই কাব্যকে চিরঞ্জীব করে। এ প্রাণ দেশকালের গণ্ডীতে আবদ্ধ নয়, এ প্রাণের মূল গতের মধ্য দিয়া অনাগতকে আহ্বান করে, এ প্রাণের মৃত্যু নাই। এ প্রাণে বিশ্বজনের প্রাণস্পন্দন অনুভূত হয়। জগতের সঙ্গে কবির মনে এইরূপ একটি অনাহত যোগসূত্র চিরদিন সংযুক্ত আছে। এ সংযোগ রসের, ভাবের এবং অনুভূতির—বস্তুর স্থূল দেহের সহিত নয়, বস্তুর সূক্ষ্ম দেহের সহিত। এই জন্য যেখানে বস্তুর সহিত কাব্যের বা সাহিত্যের যোগ হয়, সেখানে সে রচনা আর যাহাই হউক, সাহিত্য হয় না। কারণ, সাহিত্য সৌন্দর্য্যেরই রসঘন মূর্ত্তি। রসের বিলোপ নাই, বিনাশ নাই, ক্ষয় নাই, তাই প্রকৃত সাহিত্যেরও মৃত্যু নাই।

সাহিত্য সত্য শিব ও সুন্দরের কিরণ-লেখা। সাহিত্য ভাষার খাঁচায় সত্য-শিব-সুন্দরের শুকপাখী। সাহিত্য ভাষার কাচে সত্য-শিব-

সুন্দরের অনির্ব্বাণ বহ্নিশিখা। মানবমন চিরন্তন, মানবের সুখদুঃখ মিলন বিরহ, আশা-নিরাশা, হাসি-অশ্রু সার্ব্বকালীন্ সার্ব্বজনীন ও চিরন্তন।

মানুষের মন লইয়াই সাহিত্যের কারবার, মানুষের অন্তরেই তাহার প্রতিষ্ঠা। তাই মানুষের হাসি-অশ্রুই সাহিত্যের উপাদান! এই অম্লান হাসি-অশ্রুর বরমাল্যখানি রচনা করিতে পারিলেই সাহিত্যিক কৃতার্থ। সাহিত্যিকযশোপ্রার্থী সকলেই এই চিরন্তন হাসি-অশ্রুর সন্ধানেই ফিরিতেছে।

মানুষের জীবনে হাসি ও অশ্রু ভিন্ন আর কোন সম্পদই নাই। মানব-জীবন এই অশ্রু-হাসির অখণ্ড মালা। ক্ষণে ক্ষণে অহরহ হাসির আলো ও অশ্রুর মেঘে মানবের জীবনধারা কখনও ইন্দ্রধনুর বহুবর্ণে রঞ্জিত হয়, কখনও বা গভীর কালো ছায়ায় অন্ধকার হইয়া, যে বিচিত্রতার সৃষ্টি করে, কবির মনে তাহাই কাব্যরসের মেঘ-সঞ্চার করিয়া দেয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখের অণু এবং হাসি-অশ্রুর খণ্ডগুলি একটা বিরাট অখণ্ড কাব্যের রূপ ধরিয়া মানবমনে এক নবীন আনন্দলোক রচনা করে: যে আনন্দের গীতা সৃষ্টি করিতে—নব নব ভাষায়, নব নব ছন্দে, নব নব সুরে, দেশে দেশে যুগে যুগে জনে জনে কঠিন তপস্যায় নিমগ্ন।

কবির অন্তরলোকে প্রতি মুহূর্ত্তে যে সমুদ্রমন্থন চলিতেছে, যে বিশ্বরূপ প্রতিনিয়ত তাঁহার ধ্যাননেত্রে প্রকটিত হইতেছে, যে-স্বর্গ-নরক তাঁহার মানসপটে মুহুর্মুহু জন্মমৃত্যুর দোলায় দুলিতেছে, তাহারি খণ্ডচিত্র কবির লেখনীমুখে আনন্দমন্দাকিনীর- শান্তশীতল শীকরকণা ছড়াইয়া, নিত্য রসিকের মন মুগ্ধ করিতেছে! সাহিত্য মানসনন্দনবনেরই পারিজাত, ধরণীর ধূলায় তাহাকে পাওয়া যায় না।

দীপালী, ২৩শে মাঘ, ১৩৪২

বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গালী

কত যুগের কত বন্যার পলিমাটি পড়িয়া নদী বা সাগরসৈকতে বহু শতাব্দীতে যে ভূমি গড়িয়া উঠে, সেইটিই ক্রমশ গ্রাম জনপদ ও নগরে পরিণত হয়। মানুষ সেই সৈকতভূমিকে নিজ নিজ প্রয়োজন সভ্যতা সংস্কৃতি ও রসানুভূতি দিয়া তাহাকে নগর করিয়া তোলে, আর এই স্থানই হয় সুন্দর স্বাস্থ্যপূর্ণ নিরাপদ এবং একান্ত নির্ভরযোগ্য মানুষের অত্যজ্য বাসস্থান। সমবেত চেষ্টায় ও ঐকান্তিক যত্নে সেই স্থান হইয়া উঠে অপরূপ। ভূমি যে ভাবে কাঞ্চনসৌধকিরীটিনী নগরীতে পরিণত হয়, দেশের ভাষাও তেমনি করিয়া বহু শতাব্দীর বহু জাতির ও বহু সভ্যতার সংমিশ্রণে ও সম্মিলনে যে-রূপ গ্রহণ করে, তাহাই হয় সেই দেশের এবং সেই জাতির ভাষা। ভূমির উপর নগর গড়িয়া মানুষ যেমন সে-ভূখণ্ডকে অপরূপ করিয়া তোলে, ভাষার উপর তেমনি মানুষ সাহিত্য-রচনা করিয়া, ভাষাকে করিয়া তোলে রসঘন ভাবৈশ্বর্য্যের অতীন্দ্রিয় একটি আনন্দলোক! এ আনন্দলোকের পরিচয় পাইতে হইলে মনকে রসাশ্রিত, হৃদয়কে প্রসারিত ও বুদ্ধিকে অকুণ্ঠিত করিতে সাধনা করিতে হয়।

বাঙ্গলা ভাষা সংস্কৃতরসকল্পদ্রুমের কন্যা। সহস্র সহস্র বর্ষের অগণিত রসবেত্তা ও রসিকের ভাবরসধারায় অভিসঞ্চিত হইয়া, বৌদ্ধ মোগল ও ইয়ুরোপীয় সভ্যতার চন্দনতিলকে বাঙ্গলা ভাষা বাঙ্গালীর মাতৃভাষায়

পরিণত হইয়াছে! ইহা কোনও বিশেষ গোষ্ঠী বা ব্যক্তির গড়া বা দেওয়া নয়, এ-রূপ আধুনিকও নহে। বাঙ্গলা ভাষা এ-রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে অত্যন্ত স্বাভাবিক নিয়মে, যেমন পর্ব্বতে বনে ও তীরভূমিতে নগর গড়িয়া উঠে। শিশু যেমন বাল্যে, কৈশোরে ও যৌবনে আপনা-আপনি উপনীত হয়, বাঙ্গলা সাহিত্যও তেমনি সহজ প্রাকৃতিক নিয়মেই এবং অগণিত সেবকের সেবায়, আজ বিশ্বের দরবারে উন্নতশিরে দাঁড়াইয়াছে। আর এই উন্নতির মূলে আছে, সমগ্র বাঙ্গালী জাতির সমবেত সাধনা। বাঙ্গালী হিন্দু বহু পথে অধঃপতনের অতলে মহাযাত্রা করিয়াছে, সত্য, কিন্তু তাহারা বাঙ্গলা সাহিত্য-সেবার ব্রত কোনও দিন ভুলে নাই বলিয়াই, আজও হিন্দু-বাঙ্গলা তথা বাঙ্গালী জাতি এবং বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য জীবিত আছে।

বাঙ্গালী বলিয়া যদি বাঁচিয়া থাকিতে হয়, বাঙ্গালী বলিয়া যদি রাষ্ট্রীয় অধিকারলাভে প্রয়াসী হইতে হয়, বঙ্গদেশের সহিত যদি সাংসারিক অর্থনৈতিক ও নিত্যনৈমিত্তিক সংশ্রব রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে হইতে হইবে সর্ব্বাগ্রে বাঙ্গালী—জাতিবর্ণধর্ম্মস্বার্থনির্ব্বিশেষে খাঁটি বাঙ্গালী। বাঙ্গালী—বাঙ্গালীই সর্ব্বাগ্রে, সর্ব্বকালে ও সর্ব্বস্থানে। আগে বাঙ্গালী, তাহার পর হিন্দু মুসল্‌মান্ জৈন বৌদ্ধ খৃষ্টান—ধনী দরিদ্র—বড় ছোট—রাজা প্রজা। ধর্ম্মমত মানুষ ইচ্ছা করিলে পরিবর্ত্তন করিতে পারে, করেও—কিন্তু জাতি ইচ্ছা করিলেই বদলান যায় না! আজ যে হিন্দু, কাল সে মুসলমান বা খৃষ্টান হইতে পারে, অথবা তদ্বিপরীতও খুবই সম্ভব। কিন্তু বাঙ্গালী ইচ্ছা করিলেই মাদ্রাজী বা পাঞ্জাবী যেমন হইতে পারে না, তেমনি মাদ্রাজী বা পাঞ্জাবীরও ইচ্ছামাত্রেই বাঙ্গালী

হওয়া অসম্ভব। বাঙ্গলা ভাষা বাদ দিয়া বাঙ্গালী হইতে যাওয়া, আর বিনা আমে আমসত্ত্ব তৈরী করা, একই প্রকার।

পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ হইতে প্রত্যেক জীবেরই এক একটি বিশিষ্ট যেমন ভাষা আছে, মানুষেরও তেমনি আছে! এই ভাষাকে মানুষ মাতৃভাষা আখ্যা দিয়াছে। যে-বাঙ্গলা ভাষায় বাঙ্গলা দেশের ও জাতির সভ্যতা বিজ্ঞান ভাবধারা ও কৃষ্টি ওতপ্রোতভাবে মিলিয়া তাহাকে বাঙ্গলা করিয়াছে, সে-ভাষা হইতে বাঙ্গলাত্ব বাদ দিতে গেলে, মাখন-তোলা দুধের মত, বাজারে দুধ নামে সেটি বিক্রয় হইতে পারে, কিন্তু দুধ-ত্ব তাহাতে বড় থাকিবে না। সে-দুধ খাইয়া যেমন জীবন-ধারণ করা চলে না, বাঙ্গলা ভাষা হইতে তেমনি বাঙ্গলাত্ব বাদ দিয়া মাত্র মৌখিক ভাষা করিয়া রাখিলেও, তাহা বাঙ্গলাও হইবে না, বাঙ্গালী জাতিকে বাঁচাইয়া রাখিতেও পারিবে না।

হঠাৎ আজ একদল তারস্বরে চিৎকার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, বাঙ্গলা ভাষা ভয়ানক হিন্দুগন্ধী এবং ইহার সাহিত্যে হিন্দুভাব ও হিন্দু চিন্তাধারাই সবটা অধিকার করিয়া বসিয়া আছে! অতএব ইহাকে একটু অহিন্দুভাবাপন্ন করা চাই, যেহেতু বাঙ্গলায় অহিন্দুরাই সংখ্যায় গরিষ্ঠ! এই অদ্ভুত যুক্তি এবং সংখ্যাগুরুত্বের দাবীতে যাঁহারা বাঙ্গলার ভাষা ও সাহিত্যে জোর করিয়া অ-বাঙ্গালী অ-হিন্দু ভাষা ও ভাব ঢুকাইতে বদ্ধপরিকর, তাঁহারা নিশ্চয়ই জানেন না যে, দলবদ্ধভাবে বা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতার সাহায্যে বহু কর্ম্ম ও কু-কর্ম্মের সংঘটন করা যাইতে পারে,কিন্তু শিল্প সাহিত্য বিজ্ঞান বা কলাচর্চ্চা সম্ভব হয় না। পৃথিবী আজ যাঁহাদের মনীষার দানে এমন রমণীয় ও

লোভনীয়, তাঁহারা সকলেই দলের ও সমাজের একান্ত আড়ালে বসিয়া, একাকী ধ্যানসমাহিত হইয়াই নিজ নিজ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন—সদলবলে, মহাসমারোহ করিয়া, প্রকাশ্য রাজপথে শোভাযাত্রা করিয়া নহে। আজ আমরা যাঁহাদের নামে বাঙ্গলার ও বাঙ্গালীর গৌরব করি, তাঁহারা যে সংখ্যালঘুর দলেরই, এ কথাও অস্বীকার করিলে চলিবে না।

আজ বাঙ্গলার জনসংখ্যায় মুসলমানের সংখ্যাধিক্য হয়ত ঘটিয়াছে, কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বে তাহা ছিল না। যদিও মুসলমানের এ সংখ্যাধিক্যে ধর্ম্মান্তরগৃহীত হিন্দুর সংখ্যাই অধিক। সংখ্যাতেও যেমন অধিক, জ্ঞানে বিদ্যায় বুদ্ধিতে কৃষ্টিতে এবং চিন্তাশীলতাতেও তখন হিন্দুই ছিল বাঙ্গলায় সমুন্নত জাতি, কাজেই বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যে যে হিন্দুর কৃষ্টির পরিচয় সুলিখিত থাকিবে, ইহাতে অধুনা যাঁহারা বিক্ষুব্ধ হইতেছেন, তাঁহারা বর্ত্তমান কালের সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দুর পানে একটু স্থিরভাবে চাহিলেই বুঝিতে পারেন! অদ্যাপিও বাঙ্গালায় হিন্দুরাই চিন্তা-নায়ক। এমন কি সাধারণ গ্রন্থকার ও লেখকের সংখ্যাও হিন্দুদিগের মধ্যেই সমধিক! এতদিন এই দেশে বসবাস করিয়া সাহিত্যের জন্য তাঁহারা কিছুই করেন নাই, আজ হঠাৎ অকিঞ্চিৎকর যৎসামান্য রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ করিয়াই, তাঁহারা যদি প্রচলিত ভাষা ও সাহিত্যকেও তাঁহাদের আজ্ঞাবহ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠেন, তাহা হইলে ইহাই তাঁহারা প্রমাণ করিবেন যে, এতদিন যে-কারণে তাঁহারা কোনও অধিকার পান নাই, সে-কারণ এখনও সম্পূর্ণ বিদ্যমান। সুতরাং যাহা পাইয়াছেন, তাহারও প্রকৃত অধিকারী তাঁহারা এখনও হইতে পারেন নাই। বড়কে

হিংসা করিয়া, চাপা দিয়া, খর্ব্ব করিয়া কখনও বড় হওয়া যায় না, বড়কে বুঝিয়া, চিনিয়া, শ্রদ্ধা করিয়া, তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই বড় হইতে হয়। হিন্দুর রচিত বাঙ্গলা সাহিত্য পছন্দ না হয়, তাঁহারা মুসলমানী বাঙ্গলা সাহিত্য রচনা করুন। হিন্দুরা তাহাতে বাধা দিবে না। তবে রাষ্ট্রীয় অধিকারের জোরে বর্ত্তমান সাহিত্য ও ভাবধারায় বিদ্বেষবশতঃ হস্তক্ষেপ করিতে গেলে নিশ্চয়ই আমরা বাধা দিব। জমি কিনিয়া বাড়ী তৈরি করুন, সুখী হইব ঃ কিন্তু যাহাদের বাড়ী নাই, তাহারা বাড়ীর জন্য যদি অন্যের বাড়ীতে প্রবেশ করে,তাহা হইলে তাহাকে আইনেও বলে অনধিকারপ্রবেশ।

অনেকে আছেন, যাঁহারা মিষ্ট রসের মোটেই পক্ষপাতী নহেন, পেঁয়াজের ঝালফুলুরী খাইতে ভালবাসেন। এখন ইঁহারা যদি পেঁয়াজের ঝালফুলুরী না কিনিয়া, বিপক্ষ দলের দেখাদেখি মধু কিনিয়া, মধুতে উক্ত আস্বাদ চাহেন, এবং তাহা না পাইয়া যদি জোর করিয়া মধুতে কিছু কাঁচা পেঁয়াজের রস ও লঙ্কাবাটা মিশ্রিত করিয়া খাইতে চাহেন, তাহা হইলে তিনি হয়ত একটা নূতন কিছু করিবেন, কিন্তু বিশ্ববাসী অন্য সকলেই ইহাতে হাততালি দিবে, বাহবা কখনই দিবে না। অহিন্দুর দল যদি আজ বাঙ্গলা সাহিত্য হইতে হিন্দুভাব ও চিন্তাধারা বাদ দিবার জন্য জোর করিয়া বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যে অন্য কিছু ঢুকাইতে চেষ্টা করেন, তবে তাঁহাদের সে প্রয়াস হইবে মধুর মধুত্ব বিনাশকল্পে, তাহাতে পেঁয়াজের রস ও লঙ্কা সংমিশ্রণের মতই একটা লঙ্কাকাণ্ড।

ইঁহারা যদি বলেন যে, বাঙ্গলা ভাষার বর্ত্তমান ভিত্তিতে মুসলমান সভ্যতার পলি যখন পড়িয়াছে, তখন মুসলমানী প্রভাবই বা ইহাতে থাকিবে না কেন? ইহার উত্তরে এইটুকুমাত্র বলা চলে যে, যত-

টুকু পড়িয়াছে, ততটুকুই গৃহীত হইয়াছে। স্রোতস্বতী নদীতে কতটুকু পলি পড়িবে, তাহা নদীই জানে, তীরবাসীর আক্ষেপে যাহা পড়িবার তাহার কম বা বেশী কিছুতেই পড়িবে না! গঙ্গা কলিকাতার প্রান্তবাহিনী হইলেন, অথচ বাঁকুড়া বা দার্জ্জিলিঙ-এর ত্রিসীমানায় গেলেন না, ইহাতে বাঁকুড়া ও দার্জ্জিলিঙবাসিদের ক্ষোভ হইতে পারে, কিন্তু সে বিষয় লইয়া রাগ করিলে গঙ্গা ভাগ হইবে না, মনেই শুধু দাগ পড়িবে। ভাষার শারীর ধর্ম্ম যে খাদ্য হইতে যতটুকু রস দরকার সে তাহা লইয়াছে। কিন্তু ইহারা তাহা না মানিয়া বলিতে চাহেন, যে ছাগমাংস খাইয়া যখন শক্তিসঞ্চয় করিয়াছ, তখন পুরাপুরি ছাগল হওয়া চাই, নচেৎ ছাগবংশ দুঃখিত হইবে !! অন্যান্য দেশীয়েরাও—যেমন পর্ত্তুগীজ, ডাচ্, ডেনিশ, ফরাসী ও ইংরাজ—যদি দাবী করিয়া বসেন, যে তাঁহাদেরও কিছু কিছু যখন বাঙ্গলা ভাষায় আছে, তখন তাঁহারাই বা বাদ যাইবেন কেন? তাহা হইলে এ কোথায় গিয়া দাঁড়ায়, ইহারা একবার চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন কি? এই যে বাদ দেওয়া লইয়া বিবাদ, ইহার মীমাংসা একদিনে বা এক শতাব্দীতে, একজনের বা একটি সমাজের সাধনাহীন কেবলমাত্র দাবীতেই কখনও সাব্যস্ত হইবে না। তাঁহারা সুবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া যদি সত্যকার সাহিত্য রচনা করেন, সে সাহিত্যও জনসাধারণে সমাদৃত হইতে পারে। ঈর্ষ্যাবশতঃ প্রচলিত সাহিত্য ও ভাষার গায়ে কালি ছুঁড়িয়া, কালো করিতে চাহিলেই যে তাহা কালো হইবে, এ আশা দুরাশা। আর যদিই হয়, তাহাতেই বা কি সুফল ফলিবে? হিন্দুর আবিষ্কৃত ম্যালেরিয়ানাশক ঔষধটি ব্যবহার না-করিবার পূর্ব্বে তদনুরূপ একটি ঔষধ বাহির করিয়া, তবে পরিত্যাগ

করাই কি বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়? ইহারা যদি এমন জিদ ধরিয়া বসেন যে, আমরা মরিব, তবু হিন্দুর ঔষধ ব্যবহার করিব না—তাহা হইলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা।

দেশের অন্ন জল ও বায়ু প্রাকৃতিক নিয়মেই ইঁহারা পাইয়া থাকেন, কিন্তু সেগুলি ব্যবহারকালীন ইহারা ত কখনই প্রশ্ন তুলেন না যে, হিন্দুরা যে অন্ন এবং জলবায়ু ব্যবহার করে, সংখ্যাগরিষ্ঠ অহিন্দুরা তাহা করিবে না। হিন্দুর ক্ষেতের ধান্য, ভট্টাচার্য্যপাড়ার পুষ্করিণীর জল বা ব্রাহ্মণপল্লীর হোমহবির্গন্ধী বাতাসকে ত ইহারা পরিশুদ্ধ করিয়া ব্যবহার করেন না? ভাষাও এমনি অন্ন জল বায়ুর মতই চলিতে চলিতে, লোকের মুখে কণ্ঠে ও অন্তরে তাহার যাবতীয় সুখদুঃখের একমাত্র বাহন হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গলা ভাষা হঠাৎ এমন কি অপরাধ করিল যে, আজ একমাত্র তাহারই জাতিনির্ণয়ে একদল তাহার চলার পথে অচলায়তন সৃষ্টি করিতে এমন ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন?

বাঙ্গলা ভাষায় যখন আর্‌বী ও পারশী শব্দ প্রবেশ করিয়াছিল, তখন বাঙ্গলায় মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া দূরে থাকুক্, নিতান্ত নগণ্যই ছিলেন। মুসলমান দেশের রাজা ছিলেন, সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহাদের জনসংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম। রাজা এমন আদেশ কখনও দিয়াছেন বলিয়া ইতিহাসে লেখে না যে, বাঙ্গলা ভাষায় আর্‌বী ও পার্‌শী শব্দ ঢুকাও। নদীর প্রবহমান স্রোতে ভাসমান পত্রপুষ্পের মত আর্‌বী পার্‌শী ও অন্যান্য বহু দেশজ এবং বিদেশজ শব্দ বাঙ্গলা ভাষার নদীতে আসিয়া পড়িয়াছিল, যাহার কিছু বাঙ্গলার ভাষা ও সাহিত্য-সাগরে আসিয়া পৌঁছিয়া, বাঙ্গলার অত্যাজ্য অন্তরঙ্গরূপে রহিয়া গিয়াছে। এই কারণে আজ গায়ের

জোরে নূতন কিছু ঢুকাইবার প্রয়াসও ব্যর্থ হইবে। অথচ যাহারা আছে, তাহাদিগকে সরানও বাঙ্গলা ভাষার পক্ষে অসম্ভব! যে-সব বিদেশী শব্দ বাঙ্গলা ভাষায় স্থায়ী ভাবে বসবাস করিতেছে, তাহারা আর বিদেশী নাই : বর্ত্তমান কলা, বাতাবিলেবু, আনারস, চা এবং কফির মতই একান্ত স্বদেশী হইয়া পড়িয়াছে, যেমন মোগল বাদ্‌শাগণ আফ্‌গানিস্থানের স্বপ্ন ভুলিয়া, হইয়াছিলেন পূরাপূরি ভারতবর্ষীয়।

এই অর্থনৈতিক দুর্গতির দিনে অর্থ ও অন্নসমস্যার সমাধানে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে দলাদলির একটা কারণ বোঝা যায়, কিন্তু ভাষার উপর অযথা ও অযৌক্তিকভাবে হস্তক্ষেপের মধ্যে দেশের সাহিত্যে ও শিক্ষায় একটা আত্মঘাতী বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা ছাড়া, এ আন্দোলনের মূলে আর কি সদুদ্দেশ্য থাকিতে পারে?

সাহিত্যের জাতি ধর্ম্ম বর্ণ ও বয়স নাই! সাহিত্য সার্ব্বজনীন, সার্ব্বকালীন, চিরন্তন। যাহা কিছু সত্য শিব ও সুন্দর, তাহাই সাহিত্যের বিষয়; অসুন্দর কুৎসিত ও ক্ষুদ্র যাহা, সাহিত্যে তাহার স্থান কোনও দিন হয় নাই, কখনও হইবেও না। যুগে যুগে দেশে দেশে এই মহাসত্যটি নিষ্ঠুরভাবে প্রমাণিত হইয়া আসিতেছে।

মানবের প্রাণশক্তি বহু চর্ব্ব চোষ্য লেহ্য ও পেয়ের রসসারে প্রতি মুহূর্ত্তে সঞ্জীবিত হইতেছে; অথচ যাহারা প্রাণশক্তির এই রসদ যোগায়, তাহারা কিন্তু সশরীরে সেখানে বর্ত্তমান থাকে না, থাকে তাহাদের অমূর্ত্ত রস, গুণ ও শক্তি। বিভিন্ন খাদ্যের রসসার বৈজ্ঞানিক ও প্রাকৃতিক নিয়মে মানবের এই দেহ মন মস্তিষ্ক বিদ্যাবুদ্ধি ধীশক্তি ও প্রাণ; সকলেই প্রাণশক্তিকে সহায়তা করিতেছে সহযোগে, অসহযোগের

দ্বারা নয়। শরীরে প্রবিষ্ট কোনও খাদ্য যদি দৈবাৎ অসহযোগ করে, তাহা হইলে তাহার ফল যে কি হয়, দেহী মাত্রেই কখন না কখনও নিশ্চয়ই তাহা উপলব্ধি করিয়াছেন! অথচ, হঠাৎ স্বাস্থ্যলাভের আশায় যদি কেহ কোনও অতীব পুষ্টিকর ঔষধ বা খাদ্য অতিমাত্রায় গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাহারও যে কি সুফল হয়, তাহাও নিশ্চয় ইঁহারা জানেন। যাহা সয়, তাহাই কর্ত্তব্য। ভাষার বেলাতেও তাই। বাঙ্গলা ভাষাতেও বহু বিদেশজ শব্দ ইহার প্রাণশক্তির সহায়ক বলিয়া, জোর করিয়া অনাবশ্যকভাবে ইহার মধ্যে অন্য কিছু ঢুকাইতে গেলে, তাহার ফলও হইবে আশু অপমৃত্যু, ভাষার এবং ভাষীর, উভয়েরই।

দীপালী, ১৪ই শ্রাবণ, ১৩৪৩

বাঙ্গলা সাহিত্যের জনপ্রিয়তা

গত বিশ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলা দেশে এত বাঙ্গলা-লেখক এবং বাঙ্গলা সাহিত্যানুরাগী লোক জন্মিয়াছেন যে, বিশ বৎসর পূর্ব্বের ৫০ বৎসরেও তত হয় নাই। ইহার কারণ বিশেষ অনুসন্ধানের বিষয়, সন্দেহ নাই।

আমার মনে হয়, লোকের বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ বাড়িয়াছে সুলভ মূল্যে গ্রন্থাবলীপ্রকাশের দরুণ। প্রথমতঃ, এক একজন বিখ্যাত লেখকের যাবতীয় গ্রন্থ অত্যন্ত সুলভ মূল্যে বিক্রয় করিয়া, হিতবাদী, বঙ্গবাসী ও বসুমতী প্রভৃতি সাপ্তাহিক পত্রগুলি যে বাঙ্গলা সাহিত্যে অগণিত অনুরাগী পাঠক-পাঠিকা তৈরি করিয়া দিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বাঙ্গালীর মধ্যে বাঙ্গলা ভাষায় ও সাহিত্যে এই অনুরাগের ফলে মাত্র যৎসামান্য ব্যয়ে ঘরে ঘরে এক একটি লাইব্রেরী গড়িয়া উঠিয়াছে। এতদ্বারা গৃহস্বামী নিজেও যেমন উপকৃত হইয়াছেন, তাঁহার অসমর্থ প্রতিবেশীগণও সেই সব বই পড়িয়া তেমনি উপকৃত এবং বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রতি অনুরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

বাঙ্গলা পড়িবার এই ক্রমবর্দ্ধমান্ উৎসাহে গ্রামে গ্রামে এখন নিত্যই এক একটি লাইব্রেরী গড়িয়া উঠিতেছে। যৎসামান্য চাঁদা দিয়া লোকে মাসের পর মাস ইচ্ছামত বই পড়িতেছে। অন্যের বাড়ী হইতে চাহিয়া আনিয়া বই পড়ায় এতদিন যে একটা কুণ্ঠা, একটা লজ্জা ও একটা প্রতিবন্ধক ছিল, সেটিও আর নাই! লোকে লাইব্রেরী হইতে যে-কোনও

বই, যখন ইচ্ছা আনিতে ও পড়িতে পারে, যে-সৌকর্য্য সব সময়ে চাহিয়া আনিয়া ঘটিয়া উঠে না। আমাদের দেশে সাহিত্যিক উৎসাহের এই যে নব-জাগরণ, ইহার মূলে লাইব্রেরির উপকারিতার স্থান দ্বিতীয়।

তৃতীয়তঃ, বাঙ্গলা সাহিত্যের জনপ্রিয়তা সমধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক বাঙ্গলা ভাষার অবশ্যক প্রচলনে। শিক্ষার প্রথমাবস্থা হইতেই বাঙ্গলা ভাষায় ছাত্রছাত্রীগণকে বাধ্য করার ফলে তাহাদিগের মধ্যে প্রত্যক্ষ ভাবেই হউক, বা পরোক্ষভাবেই হউক, বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের সহিত একটা অত্যজ্য সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিতেছে, যাহা তাঁহাদের উত্তর জীবনে অনুরাগে রূপান্তরিত হইতেছে!

চতুর্থতঃ, পঠদ্দশায় বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র, মধুসূদন প্রভৃতি বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণের নির্ব্বাচিত রচনা পড়িয়া, ছাত্রদিগের মনে তত্তৎ লেখকের সমগ্র রচনাবলী পড়িবার ঔৎসুক্য ও আগ্রহ জন্মানও খুব স্বাভাবিক। কাজেই, ছাত্রাবস্থা হইতেই বাঙ্গালী ছেলেমেয়েদের বাঙ্গলা পড়ার দিকে একটা ঝোঁক হইতেছে। ক্রমশঃ এই ঝোঁক ও আগ্রহ বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রতি তাঁহাদের অকৃত্রিম অনুরাগে পরিণত হইতেছে!

বাঙ্গলা সাহিত্য ছাড়া বিদেশীয় সাহিত্যও ছাত্রছাত্রীদিগকে বহু পড়িতে হয়। স্বদেশী ও বিদেশী সাহিত্যের চর্চ্চায় ও অধ্যয়নে এবং উভয় সাহিত্যের সংমিশ্রণে এই সব তরুণ মনে যে সাহিত্য-প্রীতির এক অনবদ্য রামধনু গড়িয়া উঠিতেছে, তাহাই তাহাদিগকে বাঙ্গলা সাহিত্যের সেবায় অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিতেছে। যে-কল্পলোকের প্রোজ্জ্বল মহিমার চতুর্দ্দিকে এই সব ভাবপ্রবণ অকুণ্ঠ মনগুলি অবিরাম ঘুরিতেছে, তাহারি আনন্দের স্বর্ণখণ্ডগুলি উল্কার মত ছিটকাইয়া পড়িতেছে, তরুণ অপরিপক্ক

মনের ততোধিক অপক্ক রচনায়। শিশুর প্রথম কাকলীর মত এ সব লেখা অনাগত লেখকের লেখায় অনুরাগ মাত্র : সেগুলি সাধারণের কোনও কাজে না লাগিলেও, সেগুলি যে নিতান্ত অকেজো, ইহাও স্বীকার করি না, বরং এই সব প্রয়াস প্রয়োজনীয়ই মনে করি।

কিছুদিন পূর্ব্বে দেশে প্রকৃত সাহিত্য-সেবার হাওয়া বহিত। তখন বাঙ্গলায় গল্প উপন্যাস কবিতার সঙ্গে ছিল ভাষাতত্ত্ব, প্রবন্ধ, সাহিত্য-সমালোচনা, ইতিহাস, সাহিত্যবিষয়ক গবেষণা প্রভৃতি। এই সব রচনায় লেখকদিগের সত্যকারের উৎসাহ সাধনা ও ভাবনার পরিচয় পাওয়া যাইত। মেসে হোষ্টেলে বন্ধুগৃহে পত্রিকার কার্য্যালয়ে, পাঠের আড্ডায় সর্ব্বত্রই সাহিত্যবিষয়ক আলোচনা চলিত। তৎকালে "ভারতী" ও "মানসী" কার্য্যালয়ে প্রতিদিন এইরূপ প্রবীণ ও তরুণ সাহিত্যিকগণের সান্ধ্য সাহিত্য-আসর বসিত এবং ভাঙ্গিত গভীর রাত্রে। তখনকার "ভারতী" ও "মানসী" কার্য্যালয়ের মত, সাহিত্যিক ও সাহিত্যসেবীদের প্রতিদিনকার সান্ধ্য-সম্মিলন একালে কোথাও বসে কি না জানি না। তবে আলাপ আলোচনার বিষয়-বস্তু যে এখন হইয়া দাঁড়াইয়াছে সাহিত্যেতর বিষয়ান্তর, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে।

কাজেই, এখন যাঁহারা সাহিত্যানুরাগী, তাঁহারা অল্প পরিশ্রমে, অল্প বিদ্যায়, ছাপার হরফে নিজের নাম দেখিবার প্রলোভনেই লিখিতে উৎসাহী হন, এবং সকলেই প্রেমের কবিতা, প্রেমের গান ও প্রেমের গল্প বা উপন্যাসের পত্তন করেন। সাহিত্য-রচনা করিতে যে অনুশীলন, অধ্যয়ন, অভিজ্ঞতা ও মননশক্তির প্রয়োজন, তাহা বিন্দুমাত্রও অর্জ্জন না করিয়া, ইহারা ছুটেন একেবারে কাগজের আফিসে—লেখা ছাপাইতে!

আলোচনা অনুশীলন ও অধ্যয়নের অভাবে ইহাদের কবিতা হয় কয়েকটি অর্থহীন অসম্বদ্ধ এবং মিষ্ট কয়েকটি কথার অস্থানিক সমাবেশ; গল্প উপন্যাসে কেবল কলেজের ছাত্রী অথবা পাশের বাড়ীর মেয়ের সহিত প্রেমে পড়া, আর তাহার পরেই মিলন বিরহ হা-হুতাশ প্রভৃতি নিজ নিজ মনের উদগ্র যৌবনের অপ্রাকৃত কামনার কালো ছায়া ও কশাঘাত! হাজারে ৯৯৯টি রচনা যুবক-যুবতীর পঙ্কিল বাসনায় অপাঠ্য।

বাঙ্গলা সাহিত্যের অনুরাগী যে পরিমাণে বাড়িয়াছে, সে অনুপাতে লেখকের কিন্তু সন্ধান মিলে না। লেখক বলিতে আমি রসবিদ্ চিন্তাশীল লেখক বুঝি। এত সাহিত্যসেবী দেখা দিয়াছেন, কিন্তু গত দশ বৎসরের মধ্যে এমন একজনও লেখকের সাক্ষাৎ মিলিল না, যাঁহার রচনায় একজন সত্যকারের নূতন লেখকের আগমনী-অভিনন্দন ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।

বাঙ্গলা লেখা এখন যেন অবসরবিনোদনের একটা সৌখীন ও গৌণ অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, মুখ্য সিনেমা-চর্চ্চা সিনেমা-চিন্তা, সিনেমা-দর্শন ও সিনেমা-সমালোচনা।

সিনেমাপ্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশে যেমন একটা অভিনব আমোদ বা অবসরযাপনের পন্থা নিরূপিত হইয়াছে, তেমনি তরুণ মনের সাহিত্য-সৃষ্টির কৃচ্ছ্র প্রয়াসকেও চিরদিনের মত অবলুপ্ত করিয়া দিয়াছে। মানুষ আনন্দ চায়। অন্য কোনও উপায়ে বাহির হইতে যখন আনন্দ পাওয়া যাইত না, তখন সাহিত্য আলোচনাই আনন্দের বিষয় ছিল। কিন্তু এখন আনন্দের সংজ্ঞা পরিবর্ত্তিত হওয়ায় এবং চলচ্চিত্রে সকল আনন্দ কেন্দ্রীভূত হওয়ায়, তরুণ মন সিনেমাতেই সমধিক আকৃষ্ট হইয়াছে। ফলে,

সাহিত্য-সৃজনী কামনা আর তাহাদের মনে নাই। সাহিত্য গিয়া দাঁড়াইয়াছে সিনেমার নটনটীদের জীবনী এবং সিনেমাসম্বন্ধীয় রচনায়।

সিনেমা দেশে যে নূতন হাওয়া বহাইয়াছে, তাহার প্রমাণ বাঙ্গলায় এই তিন-চারিশত সাপ্তাহিকের জন্মেই পাওয়া যায়। বাঙ্গলার শিশুর মত নিত্য কয়েক খানি করিয়া সাপ্তাহিক জন্মগ্রহণ করিতেছে এবং নিত্য তাহাদের শিশু-মৃত্যুও ঘটিতেছে। কিন্তু এই জন্ম-মৃত্যুর মধ্যে কতকগুলি লেখক জন্মিয়াছেন, যাঁহারা সিনেমার অভ্যুদয় না হইলে, কখনই কলম ধরিতেন কিনা সন্দেহ। কাজেই সিনেমার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেও লেখকের সংখ্যাও যে বাড়িতেছে, ইহা যিনিই বর্ত্তমান বাঙ্গলা সাহিত্যের গতিবিধি নিরীক্ষণ করেন, তিনিই লক্ষ্য করিয়াছেন! বলা বাহুল্য, এ শ্রেণীর লেখক ঠিক সাহিত্য-রচয়িতা নহেন।

সাপ্তাহিকের এই নিয়মিত সিনেমা-বিভাগীয় লেখক ছাড়া, কেহ কেহ সিনেমার গল্প ও চিত্রনাট্যেও হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। সিনেমা-সাহিত্য এতদিন সাপ্তাহিকের মধ্যেই চলিত, কিন্তু এখন মাসিকপত্রেও সিনেমা-সাহিত্য তাহার ন্যায্য স্থান অধিকার করিয়া লওয়ায়, সিনেমা-সাহিত্য যে মর্য্যাদা অর্জ্জন করিয়াছে, তাহা উপেক্ষনীয় ত নহেই, বরং বাঙ্গলা সাহিত্যের এতদ্বারা একটা দিক বিশেষ পরিপুষ্ট হইতে পারে, যদি সিনেমা-সাহিত্যের লেখকগণ এই বিষয়েই যথাযোগ্য অবহিত হয়েন। বাঙ্গলা ভাষার বাহনে সিনেমা-সাহিত্যকে সমবেতভাবে ইঁহারা যাহাতে আজ বিশ্বের দরবারে আনিয়া উপস্থাপিত করিতে পারেন, সেই চেষ্টাই ইঁহারা করুন। ইহাই হউক বঙ্গ-সাহিত্যে এই শ্রেণীর বর্ত্তমান তরুণ বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ দান!

দীপালী, ২১শে শ্রাবণ, ১৩৪৩

সাহিত্য-সৃষ্টি ও তরুণ বাঙ্গলা

মানুষ শিল্পকলার বোধশক্তি লইয়া জন্মায়, চেষ্টা করিয়া শিল্পী বা কলাবিদ হওয়া যায় না। চেষ্টায় বিশেষ কোনও বিভাগে অনুভূতি ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি লাভ হয়ত সম্ভব, কিন্তু তদ্বারা সৃজনী-শক্তি জন্মে না! রস সৃষ্টি করা যে রসিক মনের কাজ, রস-উপভোগ করাও ঠিক সেই মনেরই আর একটি অংশের ক্রিয়া! কাজেই স্রষ্টা ও সমালোচক ঠিক এক পর্য্যায়ের নয়। স্রষ্টা বড়, সমালোচক বড় নয়। স্রষ্টা অগ্রজ, সমালোচক অনুজ।

চতুঃষষ্ঠি শিল্পকলার মধ্যে সাহিত্যই এখানে আলোচ্য। সাহিত্য রচিত হয়, মানবমনের একটি সুনিবিড় আনন্দসন্ধিক্ষণে। মনের সৃজনী শক্তি থাকিলেই যে সব সময়ে সৃষ্টি সম্ভব হইবে, তাহাও নহে। এই শক্তি নির্ভর করে, বহু পরিমাণে স্রষ্টার ভূয়োদর্শন এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতার উপরে যেমন, তেমনি মনের সৃজন-কামনাকুল বিশেষ একটা অবস্থার উপরেও। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মূল শক্তি লইয়া জন্মিতে হয় এবং ক্রমশঃ জ্ঞান অনুভূতি রসবোধক্ষমতা এবং অভিজ্ঞতার অমৃতে সেই শক্তি পরিপুষ্ট হইয়া প্রতিভায় পরিণত হয়।

প্রতিভা ইঞ্জিনিয়ার। প্রতিভার পরিপোষক অন্যান্য শক্তিগুলি তাহার আদেশাধীন ভৃত্য এবং জীবনের অভিজ্ঞতা তাহার মাল-মশলা, যদ্বারা সাহিত্যের সৌধনির্ম্মাণ হয়। যত ভাল ইঞ্জিনিয়ারই হউক না কেন,ইট কাঠ চুণ শুরখি ছাড়া যেমন গৃহ তৈরি না, তেমনি যত ভাল মাল-মশলাই দাও না কেন, মিস্ত্রি ভাল না হইলেও, তাহার সদ্ব্যবহার হয় না। মিস্ত্রি এবং মাল-মশলা দুই-ই চাই, একটি বাদ দিলে অপরটি যেমন অকেজো হইয়া

পড়ে, তেমনি প্রতিভা এবং অভিজ্ঞতাও সাহিত্য-রচনায় পরস্পর অধীন,—দুইয়ের সংযোগ এবং সহযোগ ছাড়া কোনটিই কার্য্যকরী নয়।

মানুষ যখন রচনায় প্রবৃত্ত হয়, তখন সে এ সব তত্ত্বকথার বিচার করে না। নিজের শক্তির বিচার না করিয়াই সে রচনা করিয়া চলে! যাহার সত্যকারের শক্তি থাকে, সে শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়া যথাসময়ে সাধনোচিত ফল লাভ করে, আর যাহার তাহা নাই, সে প্রথমটা সোৎসাহে কিছুদিন ছুটাছুটি দাপাদাপি করিয়া, দুই চারিদিনের মধ্যেই হাঁপাইয়া পড়ে। প্রথমটা নিরুৎসাহ হয় বটে, পরে প্রথম যৌবনের সব কথাই ভুলিয়া যায়। বিলম্বে সে বুঝে, সে মিথ্যা স্বর্ণমৃগের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল।

কিন্তু যে তথ্য গভীর অনিশ্চয়তা এবং প্রাণপাত পরিশ্রমের অভিজ্ঞতা দিয়া উপলব্ধি করিতে হয়, প্রথমে সে কি করিয়া বুঝিবে? ভবিষ্যতে কি হইবে, না হইবে—প্রথমারম্ভে তাহা যখন কেহই জানিতে পারে না, তখন অনভিজ্ঞ এই তরুণেরাই বা কি করিয়া অনুভব করিবে যে, তাহাদের ভবিষ্যৎ আর যেদিকেই সমুজ্জ্বল প্রতীয়মান্ হউক না কেন, সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ তাহাদের দ্বারা অসম্ভব। আজ যাহাদিগকে 'মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী' বলিয়া আমরা অগ্রাহ্য করিতেছি, তাহারা নিজেদের সম্বন্ধে ত সে মতপোষণ করে না! তাহাদের বিশ্বাস, তাহারা ভালই লেখে, এবং এত ভাল লেখে যে সে রকম লেখা হয়ত আর কেহই লিখিতে পারে না! নিজের লেখা সম্বন্ধে সব লেখকেরই উচ্চ ধারণা থাকে, তবে এ উচ্চতা নিজ নিজ বিদ্যাবুদ্ধি ও শিক্ষা অনুযায়ী কম আর বেশী। আপনার সন্তানের ন্যায় নিজের লেখার উপর লেখকের মমতা

স্বাভাবিক—কিন্তু এই স্নেহের মাত্রাধিক্যে সন্তানের যেমন বিপথে যাইবার সমধিক সম্ভাবনা, লেখার পক্ষেও সে আশঙ্কা পূর্ণ-মাত্রায় বিদ্যমান।

প্রথম যৌবনোন্মেষের সঙ্গে মানবমনের কল্পনাসিন্ধুতে যখন চন্দ্রকর-পাতস্ফীত উত্তাল তরঙ্গের জোয়ার আসে তখন স্বভাবতঃ সে তরঙ্গাভি-ঘাতে অন্তরের উদগ্র উন্মুখ পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যরসধারা তাহার কায়ে মনে ও বাক্যে উছলিয়া পড়ে। মানুষ মনে তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না বলিয়া, ভাষায় প্রকাশ করিয়া ধন্য হইতে চায়। সেই যৌবনজলতরঙ্গে যে রচনা ভাসিয়া আসে, তাহার অধিকাংশই আসে আবর্জ্জনা, প্রবল বন্যার মুখে প্রবাহিত তৃণগুল্মলতার মত! সেগুলিকে ধরিয়া রাখিয়া জমা করিলে পরিবর্জ্জনীয় আবর্জ্জনাই বাড়ে, সম্পদ কিছুই জমে না। এ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করে তীরের লোক, বন্যাস্ফীত নদী তাহা বুঝিতে পারে না!

তরুণ লেখকগণ শুধু এইটুকু মনে রাখিয়া যদি সাহিত্য-সেবায় প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাঁহারা লাভবানই হইবেন সমধিক: শিশুর প্রথম চলার দ্বারা পথ চলা হয় না, তাহা শিশুর চলার ক্ষমতাকে জাগ্রত করে মাত্র।

জন্মজন্মান্তর সাধনা করিয়াও যে শক্তির পূর্ণবিকাশ হয় না, যে শক্তি আমরণ অনুশীলনসাপেক্ষ, যে শক্তিলাভ করিতে মানুষকে বিশ্ব-সাহিত্যের বনে বনবাসী হইতে হয়, সে শক্তি বিনা সাধনায় এত সহজলভ্য নয়।

এমন বহু রচনা পড়ি, যাহাতে লেখকের কোনও শক্তির পরিচয় পাওয়া দূরে থাকুক, ভাষার অতি সাধারণ জ্ঞানেরও কোনও নিশানা মিলে না। বাঙ্গলায় লিখিবে, (আশা দশজনে লেখক বলিবে), অথচ বাঙ্গলা ভাষায়

সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, বাঙ্গালীর মনের দেশের কৃষ্টির ও সমাজের সহিতও সম্পূর্ণ অপরিচিত! ইহা অপেক্ষা ক্ষোভের বিষয় আর কি হইতে পারে?

সকলেই রচনা করিতে চাহেন হয় গান নয় কবিতা! অধিকাংশ লেখকের রচনা পড়িয়া মনে হয়, তাঁহারা গান ও কবিতার মধ্যে যে একটা ব্যবধান আছে, তাহাই জানেন না, অথচ গান ও কবিতা নামে অজস্র লিখিয়া যান। ফলে, সেগুলি হয় কিছুই-না। অনেক লেখক গান ও কবিতার বিষয় পর্য্যন্ত ঠিক করিতে পারেন না! কবিতার বিষয় ব্যঞ্জনা ও প্রকাশ যে গানে সম্ভব নয় এবং গানের ভাবটি যে বড় কবিতায় প্রকাশ করা চলে না, এই জাতিজ্ঞান না থাকায় গান ও কবিতা দুই-ই হইয়া পড়ে অপাংক্তেয় এবং অস্পৃশ্য।

কবিতার অধিকাংশ আসে, কতকগুলি বিখ্যাত কবির সুমধুর শব্দ-সমষ্টি অস্থানে অর্থহীন ভাবে সাজান, যাহাতে না জন্মে ভাবের লাবণ্য, না খোলে রূপের ঐশ্বর্য্য। বিষয় শতকরা ৯৯টি বিরহ, যে বিরহের মধ্যে না আছে ব্যথা, না আছে সুর, না আছে অভিজ্ঞতা।

গল্পের অবস্থাও তাই—প্লটের বালাই নাই, মনস্তত্ত্বের উপসর্গ নাই—চরিত্রের স্বাভাবিকতা নাই—একটা কিম্ভূতকিমাকার পদার্থ।

ইহাকে কি তরুণ-বাঙ্গলার সাহিত্য-সাধনা বলিব?

দীপালী, ১লা মাঘ, ১৩৪৩

রেস্তরাঁ-সাহিত্য

বর্ত্তমান যুগে শুনিতে পাই, বাঙ্গলা সাহিত্যের নাকি দিন দিন এত উন্নতি হইতেছে যে, তাহার পরিমাণ করা সুকঠিন !! এ ভাবের কথা বিশেষ করিয়া আধুনিকদের মুখেই বেশী শোনা যায়, অথচ এই আধুনিকদের পূর্ব্ববর্ত্তীদের মত কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। শেষোক্ত সম্প্রদায় বলেন, এ যুগে সাহিত্য বলিয়া কোন বস্তুই এ পর্য্যন্ত তৈরি হয় নাই এবং আধুনিক সাহিত্যসেবীদের দ্বারা কখনও গৌরব করিবার মত যে কিছু হইবে, এমন ভরসাও তাঁহাদের বিশেষ আছে বলিয়া মনে হয় না।

এই দ্বিধা-বিভক্ত খাদে বাঙ্গলা ভাষায় রচিত নিত্য নব নব বহু গ্রন্থ সাহিত্যমহাসাগরের দিকে ভাসাইয়া দেওয়া হইতেছে। নিজ নিজ শিক্ষা সংস্কৃতি জ্ঞান বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতাসম্পৃক্ত হইয়া সাময়িক পত্র-পত্রিকাও নিত্য জন্মিতেছে এবং বাঙ্গলার শিশুমৃত্যুর হারের সহিত সমান তালে, অকালে অথবা অতি-শৈশবেই তাহাদের মৃত্যুও নিত্যই ঘটিতেছে। কোন্ পক্ষ যে বাস্তবিক জয়ী হইতেছে, তাহা এখন বলা শক্ত। কিন্তু দিন দিন বিবাদটা যে বেশ জমিয়া উঠিতেছে, তাহা বেশ উপলব্ধি করা যায়।

আধুনিক দল মনে করেন, তাঁহারা বর্ত্তমানে বাঙ্গলা সাহিত্যের অভিভাবক ও কর্ণধার, যেহেতু তাঁহারা আধুনিক এবং বে-পরোয়াভাবে যশস্বী ব্যক্তিগণকে গালাগালি দিতে পারেন এবং এমন কতকগুলি খিস্তি লিখিয়া ছাপার হরফে প্রকাশ করিতে সাহস রাখেন, যাহা অনাধুনিকগণ জীবনে কখনও করেন নাই এবং এখনও করিতে প্রস্তুত নহেন।

নজীর স্বরূপ ইঁহারা বলেন, সমগ্র বৈষ্ণব-পদাবলী ও রাধা-কৃষ্ণের প্রেমতত্ত্ব অশ্লীল, কাজেই সেগুলি যদি বাঙ্গলায় সাহিত্য-নামে চলিতে পারে,তাহা হইলে ইঁহাদের ব্যক্তিগত প্রেমতত্ত্বই বা সাহিত্য নামে চলিবে না কেন? ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাবুক চিন্তাশীল কবি রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া যে কোনও প্রাচীন লেখক ইঁহাদের নিকট অচল এবং অশ্রদ্ধেয়, যেহেতু ইঁহাদের মত এই আধুনিক সম্প্রদায়ের মতের পরিপোষক নয়।

এই ভাবের হিংসিত ও বিদ্বিষ্ট উক্তি কিছুদিন হইতে একটি সম্প্রদায় কর্ত্তৃক নিয়ত উদ্গীর্ণ হইতেছে, অথচ যাঁহাদের উদ্দেশ্যে এ সব লিখিত, তাঁহারা এ সবের বিরুদ্ধে কোন উচ্চবাচ্যই করেন না। কাজেই এই প্রশ্রিত আধুনিকের দল নিজেদের বিজয়গর্ব্বে আত্মহারা হইয়া নিজেরাই নিজেদের স্বল্পপরিসর আসরটুকু বেশ জমাইয়া তুলিয়াছেন। এ আসর যদি ইঁহাদের নিজ নিজ বৈঠকখানায় অথবা অন্য কোনও খানায় বসিত, তাহা হইলে হয়ত এ বিষয়ে আমাদের কোন বক্তব্যই থাকিত না, কারণ সে সব উক্তি কখনই আমাদের কাণে আসিয়া পৌঁছিত না। কিন্তু যে-লেখা ছাপার অক্ষরে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরিয়া অনর্গল বাহির হইতেছে, তাহার পাঠকসংখ্যা যত কমই হউক না কেন, তাহার একটা প্রতিবাদ করা কর্ত্তব্য-মনে করি।

আমার প্রথম প্রশ্ন, আধুনিকেরা বাঙ্গলা সাহিত্যে কি দিয়াছেন? কতকগুলি কামুকতাপূর্ণ প্লটবিহীন নীরস রচনায় নিজ নিজ মনের দূষিত কামনাই গল্প উপন্যাস ও কবিতার নামে অজস্র বাহির করিয়া, বাঙ্গলা ভাষায় একটা পূতিগন্ধময় পঙ্কিল আবর্ত্তই সৃষ্টি করিয়াছেন,

সাহিত্য কি দিয়াছেন? রস সৃষ্টি করিতে না পারিলে সে লেখা, লেখাই থাকিয়া যায়, মানবমনে রেখাপাত করে না। খিস্তিকেও সাহিত্য বলা যায়, যদি তাহাতে রস থাকে। দুঃখের বিষয়, সাহিত্যিক না হইয়া ইঁহারা খিস্তিতে খাস্তগীর হইতে চাহেন, অথচ তাহাও লিখিতে পারেন না! এরূপ অক্ষমের দ্বারা সাহিত্য কি তৈরী হইবে? রংয়ে তুলি ডুবাইয়া ক্যানভাসে দাগ টানিলেই তাহা চিত্র হয় না, এ জ্ঞানটুকু আধুনিকদের নিকট আশা করা, নিতান্ত অন্যায় বলিয়া মনে করি না। সাহিত্যরচনা করিতে যে সাধনা বিদ্যা বুদ্ধি ও জীবনের অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, তাহা যে তাঁহাদের নাই, এই কথাটিই তাঁহারা জানেন না এবং বোধ হয় মানেনও না। আমাদের পল্লীতে একটি পাগল আছে, তাহার বিশ্বাস, এই শহরে যতগুলি মোটর চলাচল করে, সব গুলিই তাহার, অন্ততঃ সবগুলিতেই তাহার সমান স্বত্বাধিকার। পাড়ার বিজ্ঞগণ বহু চেষ্টা করিয়াও অদ্যাপি তাহাকে বুঝাইতে পারেন নাই যে, তাহার উক্ত ধারণা কাল্পনিক এবং ভ্রমাত্মক!

কিছুদিন আগে অর্থাৎ বর্ত্তমানকালের আধুনিকগণের ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী-গণও এমনি বহু চিৎকার ও লম্ফঝম্প করিয়া, পত্রপত্রিকা প্রকাশ করিয়া, বাঙ্গলা ভাষায় বহু আবর্জ্জনা জড় করিয়াছিলেন; কিন্তু আজ, প্রায়.১০।১২ বৎসরের মধ্যেই সেই সব প্রতিভাধর, তাঁহাদের অমূল্য রচনাবলী এবং বাঙ্গলার সেই সব অপূর্ব্ব পত্রপত্রিকার আর চিহ্নমাত্রও নাই। ব্যাঙের ছাতার প্রাচুর্য্যে যে পথ চলা এককালে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল, বর্ষান্তে তাহাদের আর কোনও চিহ্নই রহিল না।

তাঁহারাও তখন এমনি চিৎকার করিয়াছিলেন, এমনি অশ্রদ্ধা ও মিথ্যা

দম্ভের বিজয়দুন্দুভি বাজাইয়া জনসাধারণের কর্ণপটহ বিদীর্ণ করিয়া তুলিবার উপক্রম করিয়াছিলেন ঃ এমনি কল্পনা করিয়াছিলেন যে, বাঙ্গলায় তাঁহারা এবং তাঁহাদের রচনাবলীই একমাত্র অমর ও অক্ষয় হইয়া থাকিবে—কিন্তু ১০।১২ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলা ভাষা হইতে সে সব এমনি নিশ্চিহ্ন হইয়া বিলুপ্ত হইয়াছে যে, তাহাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত প্রমাণ করা আজ কঠিন গবেষণার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বর্ত্তমান আধুনিকের দলও এমনি দশ বৎসর পরে, ইহাদের পূর্ব্বগত-গণের মত যে গত হইবেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। কারণ জগতে প্রাণশক্তিহীন কোনও জিনিষই বাঁচে না, অন্ততঃ আজ পর্য্যন্ত বাঁচে নাই। হাউই যেমন বেগে উপরে উঠে, তেমনি বেগেই মাটিতে পড়ে ঃ আর সে যখন পড়ে, তখন সে হয় সম্পূর্ণ নির্ব্বাপিত, ভস্মশেষ। দীপালোক জ্বলে ধীরে, গৃহের অন্ধকার নষ্ট করে এবং বাঁচিয়াও থাকে সারারাত্রি।

বাঙ্গলা সাহিত্য বলিতে কি-গত যুগের কি এ-যুগের আধুনিকের কোনও রচনাকেই বুঝায় না। কেহ তাঁহাদের নামও জানে না। যাঁহারা জানিতেন তাঁহারাও ভুলিয়া গিয়াছেন। ইহাদের রচনার কেহ উল্লেখও করে না, কারণ এ সব রচনায় উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না এবং এখনও নাই। এগুলিকে আমি বলি, **রেস্তরাঁ-সাহিত্য**—অর্থাৎ রেস্তরাঁ নামধারী চায়ের-দোকানে, ২।১ পয়সার চা পান করিতে করিতে ইস্কুল কলেজের অথবা বেকার ছেলে-ছোক্‌রারা যে সব লেখা পড়ে ও পড়িয়া তারিফ করে।

বাঙ্গলা সাহিত্যের কথা উঠিলেই বাঙ্গলায় ও বাঙ্গলার বাহিরে সর্ব্বত্রই সেই সব মহাপুরুষদের কথা এবং রচনাই আলোচিত হয়, যাঁহারা

এ যুগে আধুনিকদের হাতে এমন লাঞ্ছনা লাভ করিতেছেন। প্রকৃত সাহিত্যের স্বরূপই যাঁহারা চিনেন না, তাঁহাদের সাহিত্যিক যশঃপ্রার্থী হইয়া গগনভেদী চিৎকার ক্রমশঃ অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই, এই আলোচনা করিয়া, সেই সব দাম্ভিক আধুনিকদিগকে সম্মানিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছি! মানীকে অপমান করিয়া যাঁহারা সম্মানিত হইতে চাহেন এবং সত্যকে জোর করিয়া চাপা দিয়া যাঁহারা সত্যের জয় গান করেন, তাঁহাদিগকে সাহিত্যিক বলিয়া ভ্রম করা দূরে থাকুক, মানুষ বলিয়া স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত হই, কারণ এ সব ঠিক নিজের পিতাকে অপমান করিয়া, পুত্রের নিকট হইতে পিতৃসম্মান দাবী করার মতই শুধু হাস্যকর নয়, মূর্খতা।

দীপালী, ২৫শে চৈত্র, ১৩৪৩

সভাপতির অভিভাষণ

সমবেত ভদ্র-মহিলা, ভদ্র-মহোদয় ও সতীর্থ বন্ধুগণ,

আমার মত একজন নগণ্য সাহিত্য-সেবকের উপর সাহিত্য-সভার পৌরহিত্যভার অর্পণ করিয়া আপনারা সেবককে আশাতীত মর্য্যাদা দিয়াছেন সন্দেহ নাই ঃ কিন্তু আমি জানি, আপনাদের এ স্নেহের দান-গ্রহণে আমি সম্পূর্ণ অযোগ্য। তবে ভরসা আছে যে, আমার অক্ষমতার এ ত্রুটি মহামানবের এই পবিত্রতীর্থে ভবদীয় স্নেহবারিসিঞ্চিত হইয়া, নিশ্চয়ই আমার লজ্জার হেতু হইবে না, কারণ গঙ্গাতীরের মৃত্তিকাও সুরতরঙ্গিনীর সংস্পর্শে আসিয়া পবিত্রতা লাভ করে।

আমরা বাঙ্গালী। হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে আমরা বাঙ্গালী। বাঙ্গলা ভাষা আমাদের মাতৃভাষা, বাঙ্গলা ভাষা বাঙ্গালীর জাতীয় ভাষা। রাজনীতিক বা রাষ্ট্রীয় গদাযুদ্ধে বাঙ্গালীর মধ্যে যে-মতভেদ বা যে-মতদ্বৈধই থাকুক না কেন, বিভিন্ন ধর্ম্মকে লইয়া যে ভাবে দ্যুতক্রীড়াই হউক না কেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠ বাঙ্গালী লইয়া যত স্বার্থ-সংঘাতই বাধুক না কেন, বাঙ্গলা ভাষার শ্যামলক্ষেত্রে, বঙ্গমাতার অভিন্ন সন্তানবংশে, বাঙ্গালীর জাতীয় ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিতে, বাঙ্গালী এক—আর তাহাদের ভাষা বাঙ্গলাভাষা, যেমন তাহাদের দেশ এই অখণ্ড অভিন্ন ও অবিভক্ত বাঙ্গলা দেশ। বাঙ্গলা ভাষা বাঙ্গালীর এবং বাঙ্গলার হিন্দু-মুসলমানের।

শৈশবকাল হইতে হিন্দু-মুসলমানের সমবেত সেবা ও প্রাণপণ পরিচর্য্যায় বাঙ্গলা ভাষা বাড়িয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গলায় মুসলমান নৃপতিগণ বাঙ্গলা ভাষাকে চিরদিন সম্মানের আসন দিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গলা ভাষার পরিপুষ্টিকল্পে তাঁহারা বহু অর্থব্যয় করিয়া ইহাকে অকাল-মৃত্যু হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন! তাই আজ বাঙ্গলা ভাষার অঙ্গে মুস্‌লিম সাহায্যের, মুসলমান সভ্যতার ও মুসলমান সংস্কৃতির চিহ্নশ্রী অবিচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত। বাঙ্গলা ভাষায় আর্‌বী ও পারসী শব্দ-বাহুল্যও তাই আজ অত্যজ্য। উক্ত আরবী ও পারসী ভাষাগুলিকে বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য হইতে নির্ব্বাসিত করিতে হইলে, ভাষার অঙ্গহানি অবশ্যম্ভাবী—যেমন পুরাতন অট্টালিকার গাত্রস্থিত প্রাচীন পরগাছাকে উপাড়িয়া ফেলিতে হইলে অট্টালিকার সমূহ ক্ষতি সুনিশ্চিত।

প্রচলিত সচল ভাষার শব্দৈশ্বর্য্য বাড়ে আগন্তুক শব্দাবলীর দ্বারা। অগণিত চর্ব্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় খাদ্যপানীয়ের সারাংশে যেমন জীবদেহ বাড়ে, পুষ্ট হয় এবং বাঁচে, স্রোতস্বিনী নদীর তটরেখা যেমন বহু ও বিবিধ দেশানীতসম্ভারে শস্যশ্যামল ও পুষ্পিত হয়, সচল ভাষাতেও তেমনি বহু দেশজ ও বিদেশজ শব্দ আসিয়া জুটিয়া, অন্তরঙ্গ হইয়া পড়ে। এই কারণে সংস্কৃত-মাতৃক বাঙ্গলা ভাষায় আমরা পাই আরবী, ফার্‌সী, ওলন্দাজী, পোর্ত্তুগীজ, ফরাশী, ইংরাজী প্রভৃতি নানা শব্দাবলীর সাক্ষাৎ। বাঙ্গলা ভাষার এ সমৃদ্ধি কাহারও ইচ্ছাকৃত নহে, ইহা গতিশীলতার স্বাভাবিক নিয়মে স্বয়ম্ভুত।

এই বিভিন্ন অ-বাঙ্গলা শব্দ বাঙ্গলায় আছে বলিয়া, একদল বাঙ্গলা ভাষায় আরও কতকগুলি অনাবশ্যক শব্দ স্থানে অস্থানে ঢুকাইতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন।

দুর্ব্বলদেহ সন্তানকে সবল ও পুষ্ট করিতে যদি কোনও শুভানুধ্যায়ী কেবল তাহাকে ঘৃতদুগ্ধমাখম প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ খাদ্য দিয়া অতিভোজন করায়, তাহা হইলে সন্তানের তদ্বারা যেমন পুষ্টির পরিবর্ত্তে জীবনরক্ষা পর্য্যন্ত একদিন দুরূহ হইয়া পড়ে, তেমনি উক্ত হিতৈষীদের এবম্বিধ প্রচেষ্টায় বাঙ্গলা ভাষার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত শেষে থাকিবে কিনা, সে বিষয়ে গভীর সন্দেহ আছে। বাঙ্গলায় যে শব্দ প্রচলিত আছে, তাহার স্থানে অপ্রচলিত দুর্ব্বোধ্য অ-বাঙ্গলা শব্দ দিয়া ভাষার শব্দৈশ্বর্য্য বৃদ্ধির প্রচেষ্টা, আমি কোনও দিনই সমর্থন করি নাই! নদীর তীর নদী আপনিই গড়িয়া লয়, মানুষকে মাটি ফেলিয়া তৈরি করিতে হয় না; নামা-উঠার জন্য মানুষ ঘাট বাঁধাইয়া দেয় মাত্র।

বর্ত্তমানে বাঙ্গলা ভাষার লিখনভঙ্গী এবং রীতি (Style)ও এক একজনের হস্তে এক একরূপ ধারণ করিতেছে। ফলে, বাঙ্গলা লিখিবার যে একটি নিজস্ব ধারা বা ভঙ্গী আছে, সেটি লুপ্তপ্রায়! যদি কোনও অবাঙ্গালী আজ সমসাময়িক বাঙ্গলা সাহিত্য পড়িয়া বাঙ্গলা ভাষার সহিত পরিচিত হইতে চাহেন, তাহা হইলে পদে পদে তিনি বিপন্নই হইবেন বেশী, ব্যুৎপন্ন বিশেষ হইবেন না! এক এক লেখকের এক এক রকম ভঙ্গী ও রীতির সংস্পর্শে আসিয়া, শিক্ষার্থী "বাঁশবনে ডোম কানা"র মত বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষার দুশ্চেষ্টা পরিত্যাগ করিতে নিশ্চয়ই বাধ্য হইবেন।

বাঙ্গলা ভাষায় বাণানেরও, আমাদের তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর মত, বহুবিধ রূপ। এক একটি শব্দ বিভিন্ন লেখকের হাতে বিভিন্ন বাণানে প্রকাশিত হইতেছে। উদাহরণ স্বরূপ ধরুন্—'ষাইতেছি' শব্দটি, ষাইতেছি, যেতেছি, যাচ্ছি, যাচ্চি প্রভৃতি বহুবিধরূপে লিখিত হইতেছে।

'গল্প' শব্দটিও অধুনা দেখিতেছি, 'গল্‌পো' 'গপ্‌পো' রূপ ধারণ করিয়াছে। 'চলিতে' শব্দটি "চোলিতে" "চল্‌তে" "চোল্‌তে" রূপেও দেখা যাইতেছে।

আমি অকপটে স্বীকার করিতেছি, এ ভাবে অনভ্যস্ত অপ্রচলিত ও অশুদ্ধ বাণানের লেখা পড়িয়া অর্থবোধ করিতে আমার কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়, সময় সময় তুই একবার পড়িয়া চক্ষু বুঁজিয়া তবে অর্থ হৃদয়ঙ্গম করি। অবাঙ্গালী বাঙ্গলা-শিক্ষার্থীর পক্ষে একই শব্দের এ প্রকার বিভিন্ন বাণান যেমন প্রাণান্তকর, তেমনি এ সব বাঙ্গলা ভাষার প্রসার ও প্রচারেরও সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

কলিকাতা বিশ্ববিত্থালয় ঈদৃশ বাঙ্গলা বাণানের বাহুল্যে শঙ্কিত হইয়া এই ব্যভিচার নিবারণকল্পে গত বৎসর যে আইন প্রণয়ন করিলেন, তাহাও আমাদের কপালগুণে হইল অগ্রহণীয়। সংস্কৃত ও বাঙ্গলার মূল রূপ ও ধারার সহিত তাঁহাদের নিয়মের যদি আন্তরিক যোগ না থাকে,তাহা হইলে তদ্বারা বাণানের একটা রীতি হয়ত নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে, কিন্তু তাহা বাঙ্গলা হইবে না। আর ইহাও আমার বুদ্ধির অতীত যে, কলিকাতা বিশ্ব-বিত্থালয় যদি বাণানের যথেচ্ছচার নিবারণ করিতে নিতান্তই সংকল্প করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের আদেশ সংস্কৃত অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের রীতির অনুগামী হইতেই বা ক্ষতি কি ছিল? অবশ্য যদি সংস্কৃত ভাষার উপর তাঁহারা বিশেষ কোনও কারণে জাতক্রোধ হইয়া, ইহাকে বাঙ্গলা দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সে স্বতন্ত্র কথা।

বর্ত্তমানে পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা সচল ভাষা ইংরাজী। ইয়ুরোপের বহু দেশে এবং আমেরিকাতেও ইংরাজী চলে, একথা সকলেই জানেন। অবশ্য মৌখিক কথাবার্ত্তায় এবং উচ্চারণে, প্রদেশভেদে ইংরাজী

ভাষাভাষীদের মধ্যেও ইতর-বিশেষ আছে, কিন্তু লিখিবার এবং পড়িবার ভাষা সর্ব্বত্র এক, ব্যাকরণ এক, এবং লিখনের রীতি এবং ভঙ্গীও এক।

এই অদ্বিতীয়রূপের ফলেই ইংরাজী ভাষা আজ জগতে একটি শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়া বসিয়াছে। কই ইংরাজী-লেখকগণ ত বাঙ্গলা লেখকদের মত ভাষার উপর যথেচ্ছাচার করেন না? তাঁহারা নিয়ম মানিয়া চলেন। আমরা পরাধীন জাতি, স্বাধীনতা বুঝি স্বেচ্ছাচারে এবং উচ্ছৃঙ্খলতায়। কাজেই আমাদের মত নাগপাশে আবদ্ধ জাতির একমাত্র স্বাধীনতা কেবল ভাষা ও সাহিত্যের উপর, আমরা তাই সেখানে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখাইয়া স্বাধীনতার স্বপ্ন-সুখ উপভোগ করি! ইয়ুরোপ ও আমেরিকা স্বাধীন, তাহারা স্বাধীনতা কি বস্তু জানে বলিয়াই স্বেচ্ছাচারী নয়।

জানি না, কি অশুভ মুহূর্ত্তে বাঙ্গলা সাহিত্যে কথ্য ভাষার প্রবেশাধিকার ঘটিয়াছে। কথ্য ভাষা কথনের স্থান হইতে উচ্চতর স্থান লাভ করিয়া কৌলীন্য-মর্য্যাদা লাভ করিল লেখায়, আর লেখ্য ভাষা হইল বিনাদোষে কুলভ্রষ্ট! আজ বাঙ্গলা দেশে লেখকের (?) যেমন সংখ্যাধিক্য, পাঠকের সংখ্যা বোধ হয় তাহার অর্দ্ধেকও নয়। আর এই লেখক-গোষ্ঠীতে চল্‌তি ভাষার লেখকই প্রায় অধিকাংশ! হয়ত ইহাতে সুবিধা অনেক আছে: এ রীতিতে যাহা হয় একটা কিছু শীঘ্র লিখিয়া ফেলাও তেমন দুঃসাধ্য নহে: কারণ এ লেখায় রীতি ভঙ্গী বাণান ব্যাকরণের কোন ধারই ধারিতে হয় না। লেখা চলে লেখকের খামখেয়ালের পথে।

কিন্তু আজিও আমি বুঝিতে পারিলাম না, কথ্য ভাষাই যদি লিখিতে হয়, তবে প্রদেশবিশেষস্থ নগরবিশেষের কথাই কেবল কেন লিখিতে

হইবে? বাঙ্গলার প্রত্যেক জেলায় এমন কি মহকুমাতে পর্য্যন্ত কথ্য ভাষাতে যখন প্রভেদ বিদ্যমান, তখন লেখকের নিজ নিজ প্রাকৃত ভাষাই বা তাঁহারা ব্যবহার করিবেন না কেন? সকল লেখকই প্রাণপণ চেষ্টায় কলিকাতার ভাষা আয়ত্ত করিতে যখন যত্নবান্ হইতে পারে, তখন বাঙ্গলা ব্যাকরণ-অনুযায়ী মহাজন-প্রবর্ত্তিত রীতির আদর্শে প্রকৃত বাঙ্গলা ভাষা শিখিতেই বা কেন এত আপত্তি?

সকলে যদি একই আদর্শে ও নিয়ন্ত্রিত পথে লেখে, তাহা হইলে তাহার উন্নতি ও সংস্কার সম্ভব; কিন্তু অনিয়মে এবং আদর্শহীনতায় কি উৎকর্ষ হইতে পারে? রাষ্ট্রে সমাজে স্বাস্থ্যে এমন কি ট্রামে বাসে থিয়েটারে বায়োস্কোপে পর্য্যন্ত আমরা অকুণ্ঠিত চিত্তে অন্যের আইন মানি, অথচ নিজের জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যের বেলাতেই কেবল কিছু মানিব না, ইহাই বা কিরূপ যুক্তি? নিয়মে সংযমে ও শৃঙ্খলাতেই সৃষ্টি ও সৃষ্টির উৎকর্ষ, অন্যথায় বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। বাঙ্গলা ভাষা আজ যে বড় হইয়াছে, জগৎসভায় স্থান পাইয়াছে, তাহার মূলে আছে বাঙ্গলা ভাষার জন্মগত শৃঙ্খলা। কিন্তু এই শৃঙ্খলার বাঁধ আজ ভাঙ্গিতে বসিয়াছে বলিয়া, আজ বাঙ্গলায় আর একটি বঙ্কিমচন্দ্র মাইকেল দীনবন্ধু রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রের দেখা পাওয়া যাইতেছে না।

পূর্ব্বে অর্থাৎ ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বেও প্রবেশিকা এবং তাহার পরেও ছাত্র-ছাত্রীগণের বাধ্যতামূলক পাঠ্য ছিল সংস্কৃত; কাজেই মোটামুটি সকলেরই সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত কাজ-চলা-মত একটা পরিচয়ের সুযোগ ছিল। যাঁহারা এই সুযোগের সদ্ব্যবহারে যত্নবান হইতেন, তাঁহারা সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যেও ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে

পারিতেন। ফলে, ইংরাজী ও সংস্কৃত সাহিত্যের সংমিশ্রণে তাঁহারা হইতেন সত্যকারের বাঙ্গলা লেখক, এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, এই উভয় মহাদেশের জ্ঞানসমুদ্র মন্থন করিয়া তাঁহারা নিজেও যেমন লাভবান হইতেন, জাতিকেও তেমনি করিতেন নব নব ভাবে উজ্জীবিত! সেকালের এই সংস্কৃত ও ইংরাজী শিক্ষার ফলে আমরা পাইয়াছি, রামমোহন, বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, হরপ্রসাদ, জগদীশ, দ্বিজেন্দ্রলাল, আশুতোষ, ভূদেব, চিত্তরঞ্জন, প্রফুল্লচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রমুখ বাঙ্গালী মনীষীবৃন্দকে।

কিন্তু এখন বিশ্ববিদ্যালয়কে সংস্কৃত করিতে গিয়া সংস্কৃতকে বিদায় দিয়া পরীক্ষা-পাশের হয়ত সুবিধা করা হইয়াছে অনেকটা, কিন্তু বাঙ্গালীর শিক্ষার ধারা যে তদ্বারা সম্পূর্ণরূপে ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। বর্ত্তমান যুগের শিক্ষায় পাশ-করা ছাত্রেরা এবং লেখকযশঃ-প্রার্থী নবীনেরা বাঙ্গলা লেখক হইতে খুবই উদ্‌গ্রীব, কিন্তু তাঁহাদের শতকরা ৯৯ জন শুদ্ধভাবে বাঙ্গলা লিখিতেই জানেন না! বর্ণজ্ঞান, শব্দজ্ঞান, রীতিজ্ঞান প্রভৃতি কোনও সাধারণ জ্ঞানই নাই। অথচ ইহারা তথাকথিত শিক্ষিত এবং সে-শিক্ষা দিতে হয়ত অনেকের অভিভাবক সর্ব্বস্বান্ত পর্য্যন্ত হইয়াছেন। আমাদের এ দৈন্যের জন্য দায়ী কে? বিশ্ববিদ্যালয়কে আমরা যদি এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী করি, তাহা হইলে সেটি কি খুবই অন্যায় হইবে?

বর্ত্তমানে লেখকের সংখ্যা দ্রুত বাড়িতেছে বটে, কিন্তু তদ্বারা বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি বা উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে বলিয়া আমার একেবারেই মনে হয় না। এ যুগের লেখকগণ লিখিয়া লেখক

হইতে চাহেন, কিন্তু লেখককে যে একজন বড় পাঠক হইতে হয়, এ তথ্যটি তাঁহাদের অজ্ঞাত। আর এই পাঠক হইতে না পারার দরুণ, ইহাদের লেখক হওয়ার কল্পনাও ক্রমশঃ হইয়া উঠিতেছে অসম্ভব।

২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ আমরা যখন সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশ করিবার জন্য অনন্যচিত্ত হইয়া রচনা আরম্ভ করিয়াছিলাম, তখন ভাল মন্দ রাবিশ অনেক লেখাই লিখিতাম বটে, কিন্তু ছাপা হইত তাহার এক শতাংশ। ইহার কারণ ছিল একাধিক। এখনকার উদীয়মান লেখকগণ শুনিয়া হয়ত বিস্মিত হইবেন যে, তখন লেখা ছাপাইতে ছিল মাত্র ৪।৫ খানা মাসিকপত্র। সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকা যাহা ছিল তাহাতে সাহিত্য-রচনা বড় প্রকাশিত হইত না, এবং সেরূপ করার প্রথাও তখন ছিল না। কাজেই, রচনা ছাপাইবার জন্য পাঠাইতে হইত সেই সব কাগজে যাহাতে তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও মনীষীগণের রচনাও নিয়মিত প্রকাশিত হইত। তরুণদের সে গণ্ডীতে প্রবেশনিষেধ অবশ্য ছিল না, তবে সে লক্ষ্যভেদ করিতে প্রয়োজন ছিল ফাল্গুনীর মত শক্তি-মত্তার। আর, সে কালের তরুণ সাহিত্যসেবীগণকে সে শক্তি অর্জ্জন করিতে সাধনা করিতে হইত ইংরাজী ও সংস্কৃত সাহিত্যের তপোবনে।

এখন তাহার আর প্রয়োজন হয় বলিয়া মনে হয় না। এখন অসংখ্য মাসিকপত্র, গণনাতিরিক্ত সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, ত্রৈমাসিক এমন কি দৈনিক কাগজে পর্য্যন্ত সাহিত্যালোচনা হয়ঃ সাহিত্য আলোচনা অর্থাৎ উক্ত ছদ্মনামে কিছু লেখা দিয়া কাগজের শাদা স্থানটি মসীময় করা হয় মাত্র! মাসিকপত্রাদিতে প্রবন্ধ সমালোচনা গবেষণা

প্রভৃতি চিন্তাপ্রসূত জ্ঞানগর্ভ রচনা ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইয়া গল্প, কবিতা, নক্সা, সিনেমা, রঙ্গমঞ্চ প্রভৃতি লঘু সাহিত্যেরই প্রাধান্য হইয়াছে। এখন বাঙ্গলায় মাসে প্রায় ২০০০ গল্প ও ৫০০ কবিতা চাই অতগুলি মাসিক, সাপ্তাহিক, সংবাদ ও সাময়িক পত্র-পত্রিকার পত্রাঙ্ক ঠিক রাখিতে। কাজেই যে যাহা লিখে তাহাই ছাপা হয়—লেখা ছাপাইয়া কাগজ-ওয়ালাদিগকে নির্দ্দিষ্ট দিনে কাগজ সরবরাহ করিতে না পারিলে, গ্রাহকগণ ক্ষুণ্ণ হইবেন, বিজ্ঞাপনদাতাগণ রুষ্ট হইবেন এবং ব্যবসায়ে ক্ষতি হইবে। কাজেই, লেখায় এখন লেখকের অপেক্ষা কাগজেরই তাগাদা বেশী। কাগজওয়ালারা লেখা চায় না, চায় কালির আঁচড়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যেখানে মাসিক ২০০০ গল্প ও ৫০০ কবিতার দরকার সেখানে ভালমন্দ বাছবিচার চলে না। কয়লাখনির মালিক মাসে ১০,০০০ টন কয়লা সরবরাহ করিবার চুক্তি করিলে কয়লা সে দেয় ঠিকই, তবে তাহার সব কয়লা জ্বলে না, কারণ জ্বলিলে ব্যবসা চলে না, কপাল জ্বলে। আমাদের এ যুগের সম্পাদকগণও হইয়াছেন কয়লাখনির মালিকদের মত। তাঁহারা ওজনদরে কয়লা সরবরাহের অঙ্গীকাররক্ষা করিয়াই খালাশ। পরীক্ষার আগুনে এসব কয়লা লাল হয় না, তবে ধোঁয়া ও ছাই হয় যথেষ্টই।

কাগজওয়ালাদের ব্যবসা এবং প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়িয়া আমাদের দেশের তরুণ লেখকগণ যে নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই মসীলিপ্ত করিতেছেন, এ কথা কেন তাঁহারা বুঝিতেছেন না? ছাপা হরফে নাম দেখা ও রাতারাতি লেখকপদে উন্নীত হওয়ারূপ স্বর্ণমৃগের

পশ্চাদনুধাবন করিয়া, হয়ত-কিছু-লিখিলে-লিখিতে-পারিতেন এমন বহু নবীন, আজ আক্ষেপ করিতেছেন—

"আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়
তাই ভাবি মনে।"

অবশ্য লেখকের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য কাগজের সংখ্যা বাড়িয়াছে, কি কাগজের সংখ্যা বাড়ার দরুণ লেখকের সংখ্যা বাড়িয়াছে, ইহা তৈলাধার পাত্র কিম্বা পাত্রাধার তৈলের মতই গবেষণার বিষয়, সঠিক বলা শক্ত।

বাঙ্গলা ভাষার কি রূপ এবং কি রীতি হওয়া উচিত এ প্রশ্নের উত্তরে আমার নিবেদন—**বঙ্কিমচন্দ্রের বাঙ্গলাই প্রকৃত বাঙ্গলা ভাষার একমাত্র আদর্শ এবং সেই ধারার পুনঃপ্রতিষ্ঠাই আমার একান্ত কাম্য।**

কালো মেঘের ধারে ধারে যে আলোকের রজতরেখা বিদ্যমান, এ কথা ঠিক। এই যে কাগজ ও লেখকের সংখ্যাধিক্য, ইহার মধ্যে একটি অবিসংবাদী সত্য যে নিহিত আছে, সেটি বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না—সেটি বাঙ্গালীর মাতৃভাষাসেবার দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা।

কিন্তু এ আকাঙ্ক্ষা সফল করিতে, চাই আমাদের সকলের একাগ্র এক নিয়মানুবর্ত্তিতা এবং একটি মহৎ আদর্শের অবিচলিত সেবা। বর্ত্তমানের শতধাবিভক্ত ও বিভিন্ন রীতির বাঙ্গলা ভাষাকে সুনিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন, একমাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। আর এ কার্য্য করিতে হইলে কর্ত্তৃপক্ষকে করিতে হইবে সংস্কৃতশিক্ষা বাধ্যতামূলক। সংস্কৃত-শিক্ষা ব্যতিরেকে বাঙ্গলা ভাষার সেবা ও বাঙ্গলা সাহিত্য রচনা আকাশকুসুম চয়নের মতই অসম্ভব বলিয়া আমার বিশ্বাস।

প্রবল বন্যায় বহু আবর্জ্জনা আবিলতা ও পঙ্কিলতা আসিয়া জমে, কিন্তু কিছুদিন পরে সেই সকল আবিলতা তলাইয়া যায় আর জল হয় পরম বরণীয়, পানীয়। আমরাও তাই সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি ও পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, বাঙ্গলা ভাষারও সেই দিন আসুক্, আমাদের মনের সব পঙ্কিলতা ও আবিলতা দূর হইয়া গিয়া, বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যসেবা হইয়া উঠুক বাঙ্গালীর পরম পবিত্র এবং অত্যাজ্য ধর্ম্ম। **বন্দেমাতরম্।** *

শ্রীপঞ্চমী, ১৩৪৪

* নৈহাটি সাহিত্য সভায়, সভাপতির অভিভাষণ।

বাঙ্গলা ভাষা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ইংরাজী ভাষায় ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার এই শেষ। এখন হইতে শিক্ষার বাহন হইল বাঙ্গলাভাষা।

এত দিন বাঙ্গলা দেশও ছিল, বাঙ্গলা ভাষাও ছিল, কিন্তু বাঙ্গলা দেশে বাঙ্গলাভাষা ছিল সম্পূর্ণ অস্পৃশ্য, অধিকারচ্যুত, মর্য্যাদাহীন, একটা কথ্য ভাষার মধ্যে অবলুপ্ত এবং কয়েকজন নিষ্কর্ম্মা লোকের (?) হস্তকণ্ডূতি নিবারণের ঔষধস্বরূপ! কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ শিক্ষাতে বাঙ্গলাভাষাকে স্থান দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু বাঙ্গলাকে শিক্ষার প্রকৃত বাহন রূপে কর্ত্তৃপক্ষ ব্যবহার না করিয়া, ইহাকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছিলেন। না চলিলে চলার শক্তি ক্রমশঃ যেমন বিনষ্ট হয় এবং চলচ্ছক্তিহীনতা আনে জীবনে পঙ্গুত্ব ও জীবনীশক্তির ক্রমক্ষয়—বাঙ্গলাভাষারও তেমনি তেজ শক্তি ও সামর্থ্যসত্ত্বেও, তাহার চলচ্ছক্তি অপহরণের জন্য ইহার জীবন-শতদল সম্পূর্ণ বিকশিত হইতে পারিতেছিল না। ফলে, ছাত্রেরা পরীক্ষায় পাশ করিয়াও কি-ইংরাজী কি-বাঙ্গলা কোনটাই সুষ্ঠুভাবে অধিগত করিতে পারে নাই। বাঙ্গলা-ভাষা এতদিন ছিল অন্যান্য বহু কোম্পানির কাগজের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের লোহার সিন্ধুকে, নিত্যপ্রয়োজনীয় বাজারখরচের হাতবাক্সে তাহার স্থান ছিল না।

বাঙ্গালী ইংরাজীতে পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিতে যদি না-ই পারে, তাহাতে

দুঃখ করিবার তেমন কিছু থাকিতে পারে না এবং সেটা যে বিশেষ লজ্জার বিষয়, তাহাও আমি মনে করি না। কিন্তু বাঙ্গালী তাহার মাতৃভাষায় যে কথা কহিতে, পত্র লিখিতে বা কোনও জটিল বিষয় বুঝিতে পারে না, ইহা অপেক্ষা লজ্জা ও অগৌরবের পরিচয় আর নাই। পৃথিবীর সব জাতিই তাহাদের মাতৃভাষায় শিখে, মাতৃভাষায় পড়ে, মাতৃভাষায় কথা কয়, এবং মাতৃভাষায় ভাবে এবং চিন্তা করে—কিন্তু হতভাগ্য বাঙ্গলা দেশে, তথা ভারতবর্ষেই, ইহার একমাত্র ব্যতিক্রম! ভারতের অন্যান্য প্রদেশে লোকেরা তবু মাতৃভাষায় কথাবার্ত্তাদি কয় এবং তাহাদের অমার্জ্জিত নিরাভরণা দরিদ্র মাতৃভাষাকে যথোচিত সম্মানও করে। কিন্তু তথাকথিত শিক্ষিত বাঙ্গালী জনসাধারণ বাঙ্গলাভাষাকে পারতপক্ষে বর্জ্জন করিয়া, কল্পিত এক গৌরবের আকাশ-প্রাসাদে বাস করিতেই ভালবাসে। বাঙ্গালী শিক্ষিত!!

বাঙ্গালী একটু পদমর্য্যাদাসম্পন্ন ও অর্থশালী বা এক-আধবার সমুদ্রপারে যাতায়াত করিলে কিম্বা একটু মোটা মাইনের চাকরী করিলেই, হইয়া ওঠেন একজন ফিরিঙ্গি। জাতীয় পোষাক ত সর্ব্ব-প্রথমেই পরিবর্জ্জিত হয়, তাহার পর ক্রমে ক্রমে আচার ব্যবহার রীতি নীতি সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া, মাতৃভাষার মুখাগ্নি সারিয়া, তিনি হইয়া পড়েন—একটি ধোবীর কুত্তা, অর্থাৎ না ঘাটের, না ঘরের। সাহেব সাজিয়া ফিরিঙ্গি হইয়া, সাহেব-সমাজে ফিরেন কাঙালী হরিজন হইয়া, এবং বাঙ্গালীসমাজের সহিত করেন যোগসূত্রের চিরবিচ্ছেদ! ত্রিশঙ্কু এই বাঙ্গালী মহাজনদের (!) মুখ হইতে বাঙ্গলাভাষা বিমুখ হন্ এবং তাহার স্থানে জোটে অশুদ্ধ ফৈরিঙ্গ হিন্দুস্থানী এবং কিছু-

শুদ্ধ এবং কিছু-অশুদ্ধ ইংরাজী। অবশ্য, এ পরিস্থিতির মূলে বাঙ্গলা ভাষাকে এত দিন শিক্ষার বাহন না করার জন্য শিক্ষা-বিভাগের দায়িত্বও যে একেবারেই নাই, তাহাও নয়। মাতৃদুগ্ধের মত যে মাতৃ-ভাষা জীবনে প্রথম মুখে আসিয়া প্রাণকে রসশক্তিতে সঞ্জীবিত করে, সে মাতৃভাষাকে ত্যাগ করে নরাধমই, যদিও এখন বাঙ্গলা দেশে এ-প্রকার জীবের সংখ্যা ক্ষয়িষ্ণু হইলেও, ম্যামথের মত একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সাধু প্রচেষ্টায় হয়ত সে-অসম্ভবের সম্ভাবনার পথে আসিতে এইবার আর বিলম্ব না-ও হইতে পারে।

জাতির মহত্ত্ব ও কৃষ্টির পরিমাণ হয় তাহার ভাষা ও সাহিত্যের দ্বারা, অস্ত্রবল বা বাহুবলের দ্বারা নয়। ইংরাজ যে আজ অর্দ্ধপৃথিবীর একছত্রসম্রাট, তাহার মূলে আছে ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের ঐশ্বর্য্য ও শক্তি। ইংরাজী ভাষা ইংরাজের সাম্রাজ্যের বাহিরেও সমান সমাদৃত, ইংরাজী-সাহিত্যের গৌরবে। আর ইংরাজী সাহিত্য বড় হইয়াছে ইংরাজ ও অ-ইংরাজ বহু জাতির সম্মিলিত ব্যবহারে চেষ্টায় ও শক্তিতে। ফরাশী জাতির ক্ষুদ্র ফ্রান্সের বাহিরে, সমগ্র ইয়ুরোপে, ফরাশী ভাষা অদ্যাপি সুপ্রচলিত। ইয়ুরোপের বিভিন্ন জাতির মধ্যে একমাত্র কথ্য ভাষারূপে ব্যবহৃত হয় ফরাশী ভাষাই, যেহেতু ফরাশী সাহিত্য ছিল একদিন জগতে অতুল! ফরাশী ভাষাকে ফরাশী জাতি যদি বাঙ্গালীর মত অনাদর করিত, তাহা হইলে ফরাশী ভাষার ভাগ্যে এই সম্মান কখনও এমন সুলভ হইত কিনা সন্দেহ! ইংরাজী ভাষাও যে আজ ক্রমশঃ জগৎ-গ্রাহ্য হইতে চলিয়াছে, তাহার মূলেও ইংরাজের আপন মাতৃভাষার প্রতি আন্তরিক অনুরাগ, প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও অবিচলিত প্রীতি। তাহার ফলেই

গড়িয়া উঠিতেছে ইংরাজী সাহিত্যের জগৎজোড়া বটবৃক্ষ। বৃটিশদ্বীপের বাহিরে জগতের যে-কোনও ভূভাগে ইংরাজ বাস করুক্, মাতৃভাষার সেবা করিতে সে কখনও ভোলে না, দেশীয় আচার-ব্যবহার সে কখনও ছাড়ে না এবং জাতিগত স্বদেশী বৈশিষ্ট্যও সে এতটুকু ত্যাগ করে না—তাই ইংরাজ আজ এমন সর্ব্বদেশমান্য বিরাট জাতি।

বাঙ্গলাভাষার ভাগ্য আজ সুপ্রসন্ন। বাঙ্গলায় বাঙ্গলাভাষা শিক্ষার বাহন হইল বলিয়া আমরা আজ আনন্দে গদগদ হইয়া উঠিয়াছি, এ কথা শুনিলে অ-ভারতীয় কোনও লোক নিশ্চয়ই বিস্মিত হইবেন, সন্দেহ নাই—কারণ তিনি ভাবিবেন, ইহাতে পুলকের এত কি আছে? তাঁহার বিস্ময় চরমে উঠিবে যখন তিনি শুনিবেন, আমরা ইংরাজী ভাষায় লেখাপড়া শিখি, ব্যবসাবাণিজ্য করি এবং কথাবার্ত্তা কই! আমাদের সেই লজ্জার আজ অবসান ঘটিল বলিয়াই, আমাদের এত আনন্দ।

বাঙ্গলার বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বাঙ্গলা ভাষা যখন শিক্ষার বাহন হইল, তখন অ-বাঙ্গালী যে সব ছাত্রছাত্রী এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ স্কুলকলেজে অধ্যয়ন করিতেছে, তাহারা কি ভাষায় পরীক্ষা দিবে? কর্ত্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই এদিকে মনোযোগ দিয়াছেন এবং একটা ব্যবস্থাও অবশ্যই করিয়াছেন। কিন্তু আমরা বলি, এতদিন পরীক্ষার ভাষা যেমন সকল প্রদেশীয়দের জন্যই ইংরাজী ছিল, তেমনি এখন বাঙ্গলা হউক। এখন হইতে তাহাদিগকেও বাঙ্গলা শিখিতে বাধ্য করা হউক। বাঙ্গলার বাহিরে বাঙ্গলাকে যাহারা সম্মান করে না, তাহাদিগকে বাঙ্গলার রাজ-ধানীতে বসিয়াও কি বাঙ্গলা ভাষাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিতে দিয়া বাঙ্গালী

মহানুভবতা (?) দেখাইবে? যাঁহারা এই দৌর্ব্বল্য ও অক্ষমতাকে মহানুভবতা বলিয়া গৌরব কল্পনা করেন, তাঁহাদিগকে ঠিক তাহার বিপরীত মনে করাই সঙ্গত। কারণ, স্বদেশবাসীর অকল্যাণ করিয়া যাঁহারা বিশ্বপ্রেম ও মহত্ত্ব দেখাইয়া পরের দুয়ারে মান যাচনা করিয়া বেড়ান, তাঁহাদিগকে আমি দেশের শত্রুই মনে করি। সম্মান ক্লীব বা দুর্ব্বলের নয়, সম্মান শক্তিমানের প্রাপ্য অর্ঘ্য।

দীপালী, ২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬

চণ্ডীদাসের স্মৃতি-সৌধ

বাঁকুড়ায় চণ্ডীদাসের স্মৃতি-সৌধ স্থাপিত হইবে। বাঙ্গলার সর্ব্বাপেক্ষা সুপরিচিত, সর্ব্বজনসমাদৃত ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবকবি চণ্ডীদাস—অবহেলিত চণ্ডীদাস, বিস্মৃতপ্রায় চণ্ডীদাস, প্রেমের কবি, মানুষের কবি—চণ্ডীদাসের কথা এতদিনে বাঙ্গালীর মনে পড়িয়াছে। আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালী জাতির তবু যে চণ্ডীদাসের কথা মনে হইয়াছে, ইহাতে আশাতীত রকম পুলকিত হইয়াছি।

চণ্ডীদাসের স্মৃতি-সৌধ প্রতিষ্ঠার সংবাদে প্রায় বিশ বৎসর আগেকার এক বিরাট মসীশ্রাদ্ধ বা ঋষিশ্রাদ্ধের কথা মনে পড়িতেছে। একদিকে স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, দীনেশচন্দ্র সেন, সতীশচন্দ্র রায়, ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন ঘোষ, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ চণ্ডীদাসকে নান্নুর-বীরভূমের অধিবাসী বলিয়া প্রমাণ করিতে ব্যস্ত, এবং অন্য দিকে রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, সত্যকিঙ্কর সাহানা, মতিলাল দাস প্রভৃতি রথীগণ চণ্ডীদাসকে ছাতনা-মল্লভূমের আদিবাসী রূপে প্রমাণ করিতে, কিছুকাল ধরিয়া ভীষণ মল্লযুদ্ধের অভিনয় করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বিচার্য্য বিষয় ছিল, চণ্ডীদাস বীরভূমের নান্নুরবাসী না মল্লভূমের (বাঁকুড়ার) ছাতনাবাসী,

কোন সালে তিনি জন্মিয়াছিলেন, তাঁহার জীবৎকালে বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা কে ছিলেন, চণ্ডীদাস সহজিয়া ছিলেন না বৈষ্ণব ছিলেন, রামীর সহিত তাঁহার কি সম্বন্ধ ছিল, চণ্ডীদাস কয় জন ছিলেন, তিনি বাশুলী বা বাসলী কোন্ দেবীর পূজক ছিলেন ইত্যাদি। এইরূপ নানাবিধ বিতর্কের আবর্ত্তে বহু পণ্ডিত যোগদান করিয়া, প্রত্যেকেই গড়ে প্রায় দশ মণ করিয়া মস্তকস্বেদ ব্যয় করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছিলেন।

সে সব রচনা গভীর মনোযোগ ও শ্রদ্ধাসহকারে পাঠ করিয়াও আমার জ্ঞান কিন্তু কিছুমাত্র বাড়ে নাই। চণ্ডীদাসের জন্মভূমি নান্নুর-বীরভূম বা ছাতনা-মল্লভূম অমীমাংসিত থাকা সত্ত্বেও, চণ্ডীদাসের প্রতি আমার শ্রদ্ধা কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। চণ্ডীদাস নান্নুর বা ছাতনার মধ্যে কিছুই না হইয়া, যদি কটক, রোটক, আটক এমন কি লাশা কিম্বা ত্রিবান্দ্রমের অধিবাসীও হইতেন, তাহা হইলেও কবির প্রতি আমার শ্রদ্ধার একশতাংশও কমিত না। তাঁহার জন্মকাল তারিখ বা ধর্ম্মমতেও আমার কিছুই আসে যায় না! তিনি বাশুলী অথবা বাঁসলী ত্রিশূলী কিম্বা মূষলী কোনও এক দেবীর সেবক হয়ত ছিলেন, কিম্বা ছিলেন না, তাহাও তাঁহার আসল পরিচয় নয়। চণ্ডীদাসের পরিচয়—চণ্ডীদাসের পদ, চণ্ডীদাসের ধর্ম্ম—চণ্ডীদাসের কাব্য, চণ্ডীদাসের ইতিহাস—চণ্ডীদাসের বাঙ্গলার বৈষ্ণব-সাহিত্যে স্বোপার্জ্জিত অমরতা।

ঠাকুর শ্রীশ্রীপরমহংসদেব বলিতেন—এক শ্রেণীর মানুষ পাকা আমের বাগানে প্রবেশ করিয়া, বাগানে কতগুলি আমগাছ আছে, কোন গাছের কত ডাল, কোন ডালে কত আম ফলিয়াছে, তাহাই গণিয়া খুসী! আর এক শ্রেণীর মানুষ আছে, তাহারা গণনার ধার ধারে না। তাহারা মিষ্ট

পাকা আম পাড়িয়া, পেট ভরিয়া খাইয়া ও খাওয়াইয়াই পরম সন্তোষ লাভ করে। বলা বাহুল্য, আমি শেষোক্ত শ্রেণীর পেটুক!

যে-চণ্ডীদাসের অপূর্ব্ব প্রেমপদাবলী প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেবের মুখের মধু এবং তপস্যার উৎসস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল, যে-পদ-লহরী তাঁহার তন্ময় সুর-তরঙ্গে নিষ্যন্দিত হইয়া, বঙ্গ বিহার উৎকল মদ্র প্রভৃতি দেশে অকল্পিত পতিতপাবন প্রেমের কল্যাণময় প্লাবন আনিয়াছিল, যে-কাব্যের রসকথা বহু জনের তনু-মনের কলুষকালি ঘুচাইয়া দিব্য বিভা ফুটাইয়াছে—চণ্ডীদাস বলিতে আমরা, দেশ-কাল-জাতি-বর্ণ-ধর্ম্মের অতীত সেই প্রেমিক কবি চণ্ডীদাসকেই বুঝি। যে-চণ্ডীদাসের পুণ্যপ্রেমসমুদ্ভাসিত রচনাবলী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকেও মোহিত করিয়াছিল, যে-চণ্ডীদাসের সুললিত প্রেমবিগলিত পদ-মাধুর্য্যে বাঙ্গালীর রসিক মন আজিও ঐশ্বর্য্যময়, সে-চণ্ডীদাস—কোনও বিশেষ দেশ কাল বা স্থানের নয়, সে-চণ্ডীদাস বাঙ্গলার, বাঙ্গালীর এবং বিশ্ব-মানবের। তাঁহার কথা, আমাদের

কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ।

রামীর সহিত চণ্ডীদাসের যে কি সম্বন্ধ ছিল, পণ্ডিতগণ তাহার বিচার করুন, আমি তাহা খণ্ডিত করিতে চাহিব না। আমি কবির রচনার মধ্যেই পাই তাঁহার প্রকৃত পরিচয়—

তুমি রজকিনী আমার রমণী
তুমি হও পিতৃমাতৃ।
ত্রিসন্ধ্যা যাজন তোমারই ভজন
তুমি বেদমাতা গায়ত্রী॥

তুমি বাগ্‌বাদিনী হরের ঘরণী
তুমি গো গলার হারা!
তুমি স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল পর্ব্বত
তুমি যে নয়নের তারা ॥

কাজেই, চণ্ডীদাসকে সাধারণ লোকে যে কলঙ্কী ভাবিয়াছিল, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই, যদিও সে যুগের সাধারণ লোক এবং এ-যুগের অসাধারণ পণ্ডিতদের মধ্যে এই বিষয়টিতে মতের পার্থক্য বড় দেখা যাইতেছে না। কবি খেদোক্তি করিয়াছেন

জগতে জানিল কলঙ্ক ভাসিল
কাণাকাণি লোক জনে ॥

* * *

কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ ॥

যেহেতু.

পরাণে পরাণ বাঁধা আপনা আপনি ॥

*

দুঁহু কোড়ে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।

*

জল বিনে মীন জনু কবহুঁ না জীয়ে।

না দেখিলে মন করে উচাটন
দেখিলে পরাণ জুড়ায় ॥

*

চণ্ডীদাস সাথে ধোপানী সহিতে
মিশ্রিত একই প্রাণে ॥

রামীর সহিত তাঁহার প্রকৃত সম্বন্ধ রসিক পাঠকগণ তাঁহার রচনাবলীর মধ্যেই, পণ্ডিতগণের সহস্র বিচার-বিতর্ক সত্ত্বেও, নিজ নিজ বুদ্ধিবৃত্তিমত ঠিক করিয়া লইবেন। কারণ, প্রত্নতত্ত্ব মনস্তত্ত্বের দেশের বাহিরে, ভূতত্ত্বেরই সন্নিকট। কাজেই, এ বিষয় আমার মোটেই আলোচ্য নয়। দেবীমন্দিরের পূজারী ব্রাহ্মণের রজকিনী রামীর সহিত ঘনিষ্ঠতার অকপট বর্ণনায় ও সমাজে এই কলঙ্ক (?) কথার প্রকাশ্য স্বীকারোক্তিতে দেখি, চণ্ডীদাস সত্যই মানুষের কবি। এত বড় দুঃসাহসিকতা ও সত্য-প্রিয়তা জগতে আর কোনও কবির জীবনীতে কখনও দেখা যায় নাই।

বাশুলী বা বাসলী দেবীর না হউক, প্রেম ও সত্যের পূজারী ছিলেন কবি চণ্ডীদাস ঃ তাই সমাজ সংসার জাতি যশ মান সব তুচ্ছ করিয়া, নিজের প্রেমের কাহিনী তিনি অমন অকুণ্ঠিত ও সুললিত ভাষায় বলিতে পারিয়াছিলেন—

আঙিনার মাঝে তিতিছে বঁধুয়া
দেখিয়া পরাণ ফাটে ॥

*

বঁধুর পীরিতি আরতি দেখিয়া
মোর মনে হেন করে।

কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া
আনল ভেজাই ঘরে ॥

চণ্ডীদাস ছিলেন বলিষ্ঠমনা, গভীর রসসাগরের মণিদীপালোকিত অতলে লুক্কায়িত মণিকার ঃ প্রেমের মেঘ-রৌদ্রে লীলায়িত, সদা পরিবর্ত্তন-শীল ভাব-বিচিত্র মনোমালঞ্চের অপূর্ব্ব মালাকর, একনিষ্ঠ পূজারী ও কবি !

বাঙ্গলার এই অদ্বিতীয় কবির স্মৃতি-সৌধ প্রতিষ্ঠার কল্পনা করিয়া বাঁকুড়াবাসীই প্রথম জয়গৌরব অর্জ্জন করিলেন। মল্লভূমির বল্লভগণই প্রমাণ করিলেন, চণ্ডীদাসের প্রতি শ্রদ্ধা বীরভূমিবাসীদের অপেক্ষা তাঁহাদের কত অধিক। ছাতনার নিকট নান্নুর পরাজিত হইল।

এখন বাগর্থাবিবসম্পৃক্ত হইয়া চণ্ডীদাস-স্মৃতি-সৌধ গড়িয়া উঠুক, বাঙ্গালীর গ্লানি দূর হউক, বাঙ্গলা দেশ বাঙ্গালীর জাতীয় কবির সম্মান করিয়া ধন্য হউক, অমর হউক।

অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু !

দীপান্বী, ১৬ই ফাল্গুন, ১৩৩৬

চণ্ডীদাস ও রামী

চণ্ডীদাস ছিলেন কবি -- রামী ছিলেন তাঁহার কবিতা, চণ্ডীদাস ছিলেন গোমুখী—রামী ছিলেন সে গোমুখীনিঃসৃত কাব্য-মন্দাকিনী, চণ্ডীদাস ছিলেন হোতা—রামী ছিলেন যজ্ঞ। তাঁহার নিজের জীবনই ছিল আদর্শ প্রেমিকের। অনন্যোপায় অবস্থায় যে-প্রেম বন্ধন, বিধান ও নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীতে জন্মে, তাহাকে ব্যবহারিক ভাবে আমরা প্রেম বলি বটে, কারণ তাহা না বলিলে উপায়ান্তর নাই, কিন্তু আসলে তাহা প্রেম নয়—শ্রদ্ধা, আনুরক্তি বা আনুগত্য বা আসক্তি! গত্যন্তরের অভাবে বা তাহার ব্যতিক্রমে এসব ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর ব্যবহারিক, সামাজিক ও আধিভৌতিক জীবনে এমন কতকগুলি প্রতিবন্ধক আসিয়া জোটে যদ্বারা দুইজনেরই জীবনরক্ষা তখন অসম্ভব হইয়া পড়ে! ব্যষ্টির ইটে সমাজের প্রাসাদ গঠিত - কাজেই, সামাজিক শৃঙ্খলা ও বিধি অক্ষুণ্ণ, শুচি ও সক্রিয় রাখিতে হইলে, সামাজিক অরাজকতানিবারণ খুবই প্রয়োজন। এই জন্য বৈধ-বিবাহে স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসায় পরস্পরের যে অনন্যাসক্তি, উভয়ের মধ্যে যে সহানুভূতি বিচারবোধ ও মর্য্যাদাজ্ঞান, পরস্পরের মধ্যে যে ত্যাগ তিতীক্ষা ধৈর্য্য ও দুঃখবরণ, একের অভাবে অন্যের যে আমরণ কঠোর ব্রহ্মচর্য্যপালন প্রভৃতি কৃচ্ছ্র সাধনের শতশত দৃষ্টান্ত ও প্রতিক্রিয়া আমরা নিয়ত দেখি, স্থিরভাবে বিচার করিয়া দেখিলে বলিতে হয়, এগুলি যতটা সামাজিক, আচারমূখ্য, সংস্কারবিহিত, অবশ্যপালনীয়—

ততটা স্বতঃপ্রণোদিত আন্তরিক নয়! আমাদের সাধারণ প্রেমে গম্ভীরতা থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতে গভীরতা স্বাভাবিকতা বা বৈচিত্র্যের বড় স্থান নাই। এ-প্রেমের মধ্যে মস্তিষ্ক ও সাংসারিক বুদ্ধিরই স্থূলহস্তাবলেপ পরিলক্ষিত হয় বেশী, অন্তরের উষ্ণ পরশ বিশেষ পাওয়া যায় না। ইহা ভোজ্যপানীয়ের মত নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে বলিয়া এ প্রেমে বিলাস বা লীলা নাই ঃ নিতান্ত প্রয়োজনে যাহা ঘটে, তাহাতে মাদকতা নাই উষ্ণতা নাই, দুঃসাহসিকতা নাই। না-চাহিতে নিতান্ত আপনার হইয়া যে আসে, যাহাকে পাইতে কোন দিনই বেগ বা উদ্বেগ কিছুই সহিতে হয় না, যাহাকে কোনও দিনই হারাইবার ভয় থাকে না—তাহার প্রতি স্নেহ দয়া অনুকম্পা মর্য্যাদা এমন কি একটা আকর্ষণ পর্য্যন্ত সবই জন্মিতে পারে, কিন্তু প্রেম হয় না! প্রেমকে চিরদিন সতেজ ও সঞ্জীবিত রাখে ক্ষণে ক্ষণে হারাইবার ভয়, পলকে পলকে আশঙ্কা—"দুঁহু কোড়ে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।" যতক্ষণ না পাওয়া যায়, ততক্ষণ ক্ষণে ক্ষণে বাঞ্ছিতকে সম্পূর্ণরূপে পাইবার জন্য যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা, যে সহজলভ্য নয়, তাহাকে লাভ করিতে যে দুঃসাহসিকতা, যে তন্ময়তা যে-আত্মবিস্মরণ যে-মৃত্যুপণ—তাহাই প্রেম। দুর্ল্লভের একাগ্র কামনাই প্রেম। প্রেম স্পর্শ সয় না, সে সুদূরের, সে ইন্দ্রধনু, সে মায়ালোক। প্রেম—তপস্যাতেই পূর্ণ, প্রেম—না-পাওয়াতেই মধুরতম, প্রেম—অনধিগত ও অনধিগম্য। প্রেম একটা আলোক, যাহা উপলব্ধি করা যায়, কিন্তু ধরা যায় না।

প্রেমিক ও প্রেমিকার মিলনই প্রেমের পরিসমাপ্তি, প্রেমের সমাধি।

বিরহই প্রেমের জীয়নকাঠি—মিলন প্রেমের অপমৃত্যু! এই জন্যই প্রেম অ-ধর, অক্ষয়, অনন্ত। কাজেই, প্রেম চিরদিনই "কামগন্ধহীন"!

যুগে যুগে প্রেমের এই স্বরূপই কাব্যে গাথায় গানে পরিকীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। রামসীতার বিরহ-গাথায়, অভিশপ্ত বিরহী যক্ষের প্রেমোন্মাদে, বৃন্দারণ্যনিবাসিনী বৃষভানুরাজনন্দিনী শ্রীরাধার প্রিয়বিরহের কাব্যগানে, আজও আমাদের মনে মেঘমল্লার রচনা করিতেছে। স্মরণাতীত দিনের অজ্ঞাত সেই বিরহী-বিরহিনীদের খেদগাথায় আমাদের চক্ষে যে-উদ্যতঅশ্রু সঞ্চিত হইতেছে, আমাদের অন্তর যে-বেদনায় আজও ভারাপ্লুত হইয়া উঠে, তাহাদের অন্তর-বেদনা যে আমাদের নিজেদেরই মনে হইয়া কিয়ৎকালের জন্য আমরা আত্মবিস্মৃত হই, তাহার কারণ তাহাদের সে প্রেম—যে-প্রেম তাহাদের মিলনে কোনও দিন আত্মপ্রকাশ করে নাই, করিয়াছে চিরদিন বিরহে, না-পাওয়ায় বেদনাসিক্ত করুণ অশ্রুজলে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রেমের কাব্য বিরহ-কথা, মিলনোৎসব নয়।

চণ্ডীদাস তাঁহার কাব্যরচনায় তাই বৃন্দাবনী কথায় তাঁহার অন্তরের সাড়া পাইয়াছিলেন। জীবনভোর তিনি দুর্ল্লভেরই ধ্যান কয়িরাছিলেন, আর এই ধ্যানের ফলে ব্রজবাসিনী রাধার ন্যায় তিনি হইতেন পদে পদে জনে জনে লাঞ্ছিত। তাঁহার নিজের অপ্রতিহত একাগ্র কামনার সহিত মিলিয়াছিল, শ্রীরাধার আত্মসমর্পণ-কাহিনী। চণ্ডীদাস তাই রাধাভাবে এমন বিভোর হইতে পারিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর সাধনাতেও ছিল রাধাভাব, তাই চণ্ডীদাসের একান্ত-আপনার পদলহরী তাঁহাকে পরমানন্দ দিতে পারিয়াছিল। চণ্ডীদাসের পদ কল্পিত রচনা নয়, এ তাঁহার নিজের অন্তরবেদনা—শ্রীরাধাতে তিনি তাঁহারই ছদ্ম-স্বরূপকে পাইয়াছিলেন।

সই, কেমনে ধরিব হিয়া ?
আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়
আমারি আঙিনা দিয়া।
সে বঁধু কালিয়া না চায় ফিরিয়া
এমতি করিল কে ?
আমার অন্তর যেমনি করিছে
তেমতি হউক সে।

এ রচনাকে সাধারণ রচনার সহিত একাসন রসিক জন দিবে না। আপনার অন্তরে বঁধুর এই অবহেলা উপলব্ধি না করিলে, এ রচনা অসম্ভব। রামীর সহিত চণ্ডীদাসের ঘনিষ্ঠতা তাই জগতের সাহিত্যে এক অত্যন্ত স্মরণীয় ঘটনা বলিয়া মনে করি। রামীকে ভালবাসিয়া এবং লোকনিন্দা ও গঞ্জনায় তাহাকে একান্ত আপনাররূপে না পাইয়া, বাশুলী-দেবীর পূজারীর অন্তরে যে প্রেমের সম্ভব হইয়াছিল, তাহাতে প্রেমই প্রমূর্ত্ত হইয়া জগৎসমক্ষে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, কবি চণ্ডীদাস-রূপে। চণ্ডীদাসের জীবনে 'রজকিনী রামী' আসিয়া না দাঁড়াইলে, চণ্ডীদাসকেই আমরা কখনও লাভ করিতে পারিতাম কি না, সন্দেহের বিষয়।

কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনী
সুখ দুঃখ দু'টি ভাই
সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি
দুখ যায় তার ঠাঁই।

রামী চণ্ডীদাসের কাছে ছিলেন দুর্লভ ও দুর্লভ্য—তাই প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার হৃদয়ে সঞ্চিত হইত শ্রাবণের সান্দ্র মেঘমালার মত পুঞ্জীভূত

বেদনা—যে নিদারুণ অন্তর-বেদনার ব্যঞ্জনায় চণ্ডীদাসের পদাবলী এমন অভিসঞ্চিত। একান্ত নিজের বিরহব্যথা বৃন্দাবনের রাধার মুখ দিয়া প্রকাশ করিয়া, তিনি আপনাকেই ছড়াইয়া দিয়াছেন বিশ্বলোকের অন্তরে অন্তরে। রাধার শ্রীকৃষ্ণের সহিত এবং চণ্ডীদাসের "রামী-ধোপানী"র সহিত, মিলনের অন্তরায়গুলি বহুলাংশে সমজাতীয় বলিয়া, ইহাদের মিলনপথে যে পর্ব্বতপ্রমাণ বাধার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে অভিহত হইয়াই রচিত হইয়াছে এই কাব্য, যাহা জগতে আজ শ্রেষ্ঠ রসকাব্য বলিয়া পরিকীর্ত্তিত।

চণ্ডীদাস দুঃখের কবি। ঈপ্সিতকে না-পাওয়ার যে নিদারুণ জ্বালা, চণ্ডীদাস সেই জ্বালা সহিয়া, তাঁহার তপ্ত অশ্রুবিন্দুগুলি দিয়া পদের মালা গাঁথিয়াছেন। রাধার শ্রীকৃষ্ণবিরহে কি হইয়াছিল, সঠিক জানি না, তবে চণ্ডীদাসের রামীর বিরহে আমরা পাইয়াছি প্রকৃত চণ্ডীদাসকে।

কবি বলিয়াছেন—

রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পীরিতি॥
ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর॥
কোন্ বিধি সিরজিল সোতের সেওলি।
এমন ব্যথিত নাই ডাকি বন্ধু বলি॥

এই সর্ব্বত্যাগী একমুখী প্রেমের আদর্শ বৈষ্ণবসাহিত্যে চণ্ডীদাসই প্রথম আনিয়াছেন, কারণ নিজে তিনি প্রেমের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয় ছিলেন।

রসের সায়রে ডুবাহ আমারে
অমর করহ তুমি ॥

শ্রীকৃষ্ণের অমরত্বাবাঞ্ছা মর কবির লেখনীতে হাস্যকর, কিন্তু ইহা যে কবিরই বেনামী! কবির বাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে, তিনি অমর হইয়াছেন। রামী সত্যসত্যই তাঁহাকে অমর করিয়াছে।

বড় শুভক্ষণে তোমা হেন নিধি
বিধি মিলায়ল আনি।
পরাণ হইতে শত শত গুণে
অধিক করিয়া মানি ॥
আনের আছয়ে আন জনা কত
আমার পরাণ তুমি।

শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেও এ কথাটা যে খাটে, শ্রীকৃষ্ণ-চরিতজ্ঞগণ তাহা জানেন ঃ কিন্তু চণ্ডীদাসের পক্ষে এ ছিল অত্যন্ত সত্য।

রজনী দিবসে হব পরবশে
স্বপনে রাখিব লেহা।
একত্র থাকিব নাহি পরশিব
ভাবিনী ভাবের দেহা ॥

মিলন হয় নাই বলিয়াই কবি প্রতিজ্ঞা করিতে পারিয়াছিলেন—"একত্র থাকিব নাহি পরশিব" আর এই জন্যই তাঁহার প্রেম ছিল "কামগন্ধহীন"। শুধু "ভাবিনী ভাবের দেহা"—ভাবের দেহ হইয়া তুমি থাকিবে, তোমায় স্পর্শ করিব না, রাত্রিদিন এবং স্বপ্নেও তোমায় চিন্তা করিব! ইহাই আমার "ত্রিসন্ধ্যা যাজন"। ইহাই চণ্ডীদাসের পিরীতি ঃ

পিরীতি নগরে বসতি করিব
পিরীতে বাঁধিব ঘর।
পিরীতি দেখিয়া পড়শী করিব
তা বিনু সকলি পর॥

আর এই পিরীতের কাহিনী অন্য কোনও লোককে নয়, তিনি আপন মনের সুখে আপনিই বলিতেছেন ঃ

চণ্ডীদাস কয় মিছা গালি ভয়
না দেখি জনেক লোকে।
আপনা-আপনি বলহ কাহিনী
আপন মনের সুখে॥

ইহার পরেও চণ্ডীদাস ও রামীর সম্বন্ধে কি কাহারও কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে ?

দীপালী, ২৩শে ফাল্গুন, ১৩৪৬

চণ্ডীদাসের পদকাব্যে প্রেম

নয়নের শোভা অশ্রু—সুখেও অশ্রু, দুঃখেও অশ্রু। দুঃখের অশ্রুতেই প্রেমের জন্ম। তাই—

চণ্ডীদাস কয় শুন' বিনোদিনী
সুখ দুখ দুটি ভাই।
সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি
দুখ যায় তার ঠাঁই!

চণ্ডীদাস ছিলেন দুঃখবাদী। তাঁহার কাব্যে দুঃখের বিরহবেদনার ও সামাজিক নির্য্যাতনের যে-সব করুণ কাহিনী শ্রীরাধার মুখ দিয়া কথিত হইয়াছে, সেগুলি বহুলাংশে তাঁহার নিজের জীবনেই প্রত্যক্ষ উপলব্ধ এবং পরীক্ষিত বলিয়াই, সে সব ব্যঞ্জনা অমন আন্তরিকতাপূর্ণ তীক্ষ্ণ এবং সহজ ও সুললিত। বিদ্যাপতির সহিত চণ্ডীদাসের এইখানে প্রভেদ।

বিদ্যাপতির জীবন চণ্ডীদাসের অপেক্ষা সমধিক সুখের ও স্বচ্ছন্দ ছিল বলিয়া, তাঁহার কাব্যে পাই দুঃখব্যথার বর্ণনায় সমলঙ্কৃত এবং ভাষার ঐশ্বর্য্যে গরীয়সী কবি-কল্পনা। বিদ্যাপতিব কাব্য সুখের, মিলনের ও সম্ভোগের বর্ণনা-প্রাচুর্য্যে পরম রমণীয়! বিদ্যাপতির কাব্য-আলোচনা ভবিষ্যতের জন্য স্থগিত রাখিয়া, আপাততঃ চণ্ডীদাসের কাব্যই উপভোগ করা যাক্।

চণ্ডীদাসের এক রকম ছবি আমার মনে তাঁহার সহিত

প্রথম পরিচয়-দিন হইতেই অঙ্কিত হইয়া আছে। আজ পর্য্যন্ত সে চেহারার কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই এবং যতই চণ্ডীদাস পড়ি, ততই সে ব্যক্তিটি আমায় আচ্ছন্ন ও অভিভূত করিয়া তুলে। চণ্ডীদাসকে দেখি—সলজ্জ সপ্রতিভ স্বল্পভাষী করুণ-ব্যথাভরা মুখ। ইহার চোখ মুখ দৃষ্টি, মুখমণ্ডল, এমন কি, সর্ব্বশরীর পর্য্যন্ত একটা প্রতিভা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, অসমসাহসিকতা এবং স্বতন্ত্র স্বাচ্ছন্দ্যের জয়তিলকে প্রোজ্জ্বল। দেখিলেই মনে হয়, এই দরিদ্র স্বল্পভাষী লোকটি সাধারণ নয়, অসাধারণ। ভাবপ্রবণ তীক্ষ্ণধীপরিচায়ক ঢল ঢল আয়ত-চোখে প্রদীপ্ত অন্তর্দৃষ্টি, ব্যবহারে একটা সম্ভ্রান্ত সপ্রতিভ বিনয়, স্বল্প মূল্যের সাধারণ সাজসজ্জায়, একটা অসাধারণ কৌলীন্যের ছাপ। কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা, মাথাভরা অবিন্যস্ত কোঁকড়া কালো চুল, গোঁফদাড়ি কামান কিন্তু অনিয়মিত ক্ষৌরকর্ম্মের জন্য মুখমণ্ডল খোঁচা-খোঁচা। পায়ে খড়ম, খালি গা, কোঁচা-করা ধুতি-পরা, কোঁচাটি পেটের উপর গোঁজা! বাটীর বাহির হইলে গায়ে একখানি চাদর থাকে। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা ও মোটা পরিষ্কার আজানুলম্বিত উপবীত, ডান হাতের বাহুতে কয়েকটি তামার মাদুলী। মন্দিরের পিছনে বেল বা বকুল তরু মূলে নির্জ্জনে বসিয়া আপন মনে স্তব্ধ দুপুরে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া তিনি রচনা করেন। হয়ত সেখান হইতে ধোপাপুকুরটি আবছা চোখে পড়ে। লোকে তাঁহাকে নিন্দা করে, গালাগালি দেয়, সমাজচ্যুত করে, নানারকম ভয় দেখায়—তাহার কোনও উত্তর পর্য্যন্ত তিনি দেন না। লোকে তাঁহাকে নিন্দা করে এবং তাঁহাকে সম্মান করে, উপেক্ষা করে ভয়ও করে, এবং তাঁহাকে গালাগালি দিলেও তাঁহার সমক্ষে কোনও

অসামাজিক কার্য্য করিতে পর্য্যন্ত তাহারা সাহসী হয় না। বিনা প্রতিবাদে তিনি বহু নির্য্যাতন সহেন। চণ্ডীদাস কাহারও সম্বন্ধে কোনও কথাই কহেন না, অথচ সকলে তাঁহার কথাই কয়: তাঁহাকে উপহাস বিদ্রূপ করে এবং তাঁহার পদাবলী ছাড়া অন্য গানও করে না। তাঁহাকে একঘরে করে, কিন্তু গ্রামের প্রধানা দেবী বাশুলির পূজারী তিনিই থাকেন। তিনি নতনয়নে পথ চলেন, কাহারও দিকে ফিরিয়াও চাহেন না, অথচ তাঁহাকে দেখিবার জন্য মেঠো পথে আসিয়া জুটে নান্নুর বা ছাতনা গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা। ছয়শত বৎসর পূর্ব্বে কেন, অদ্যাপি বুঝি তেমনি হয়—চণ্ডীদাস আজিও বর্ত্তমান। চণ্ডীদাস নাই, রামী নাই—ইহা মনে করিয়া মনে করিতে হয়, সহসা মনেই হয় না।

চণ্ডীদাস পড়িতে পড়িতে আমি এই চণ্ডীদাসকে দেখি। চণ্ডীদাসের পরিচয় দেয় চণ্ডীদাসের রাধা। চণ্ডীদাসের প্রেম সুখের হয় নাই—তাই তাঁহার অন্তর-বেদনা পরিব্যক্ত হইয়াছে রসঘন বিরহ বিধুর কাব্যে। তৎকালিক প্রথা অনুযায়ী, রাধা ও কৃষ্ণের বি-ষম অথচ অচঞ্চল প্রেমের সহকারশাখাকে আশ্রয় করিয়া, এই মধুমালতী বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চণ্ডীদাস দুঃখবাদী ও দুঃখের কবি। তাই তিনি জোর গলায় বলিতে পারিয়াছেন—

কেবা নিরমিল প্রেম-সরোবর
নিরমল তার জল।
দুখের মকর ফেরে নিরন্তর
প্রাণ করে টলমল॥

গুরুজন জ্বালা জলের শিহালা
পড়সী জিয়ল মাছে।
কুল পাণিফল কাঁটা যে সকল
সলিল বেড়িয়া আছে॥
কলঙ্ক-পানায় সদা লাগে গায়
ছাঁকিয়া খাইলুঁ যদি।
অন্তরে বাহিরে কুটু কুটু করে
সুখে দুখ দিল বিধি॥

তিনি অতলান্তিক বেদনা-সিন্ধুতে ডুব দিয়া এই তথ্য আহরণ করিয়াছিলেন :

"পরাণ ছাড়িলে পিরীতি না ছাড়ে"
"পিরীতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে
পিরীতি মিলায় তথা॥"
"রসের স্বরূপ পিরীতি মূরতি
কেবা করে পরতীত॥"
"বঁধুর পিরীতি আপনা বেচিনু
মিছি দিনু জাতি কুল॥"
"যে জন যা বিনে না রহে পরাণে
সে যে হৈল কুলনাশী।
"তবে কেন তারে কলঙ্কিনী বলে?"
"হিয়া দগদগি পরাণ পোড়নি
কি দিলে হইবে ভাল॥"

"চণ্ডীদাস কয় হিয়ার সহয়
সকলি গরল হৈল।
কিছু কিছু সুধা বিষগুণা আধা
চিরঞ্জীবী দেহ কৈল॥"
"কি করিতে পারে গুরু দুরজন
হয় হউ অপযশ॥"

এমনি করিয়া চণ্ডীদাস রামীর বিরহসিন্ধুতে ডুবিয়া বাঙ্গলার কাব্যভারতীর জন্য যে মণি-মুকুট রচনা করিয়াছেন, আমরা তাহারি অচঞ্চল দীপ্তিতে যৎসামান্য আলোক পাইয়াই ধন্য হইয়াছি।

জীবনে প্রেমের আসল রূপের যে একটুও দেখিয়াছে, সেই চিরদুঃখী-সৌভাগ্যবান্‌ই জানেন—

বিরহ বেদন না জানে আপন
দরদের দরদী নয়।
চণ্ডীদাস ভণে পর-দরদের
দরদী হইলে হয়॥

এত বড় কথা আজ পর্য্যন্ত আর কোনও কবি বলেন নাই।

দীপালী, ৮ই চৈত্র ১৩৪৬

বাঙ্গলা ভাষার নবযুগ

প্রায় বিশ বৎসর হইল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গলা ভাষাকে মর্য্যাদা দিয়াছেন। ছাত্র-ছাত্রীরা এখন বাঙ্গলায় সর্ব্বোচ্চ উপাধি পর্য্যন্ত লাভ করিতেছেন। এখন হইতে বাঙ্গলা ভাষা পরীক্ষারও বাহন হওয়ায় আমরা আশা করিতে পারি, এখন হইতে বাঙ্গালী ছাত্রছাত্রী ও তরুণতরুণীগণ অন্তত শুদ্ধভাবে সাধারণ বাঙ্গলা লিখিতে ও বলিতে সক্ষম হইবেন!

তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বাঙ্গলা ভাষায় কথা কহিতে শতকরা ৯৫টি অনাবশ্যক অশুদ্ধোচ্চারিত শ্রুতিকটু ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করা একদা ফ্যাশান ছিল, এখন সেটি দুরারোগ্য ব্যাধিতে পরিণত হইয়াছে। কদাচার চিরদিনই রোগের মূল। বাঙ্গালীদের মিশ্র ভাষা-ব্যবহারের কদাচার হইতে অশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষার প্রচলন-বাহুল্যও ঘটিয়াছে। সুযোগ্য সুষ্ঠু ও সুন্দর বাঙ্গলা প্রতিশব্দ থাকিতেও, তৎস্থানে অকারণ ইংরাজী কথা বলায় বা লেখায়, অজ্ঞতা যতটা হউক বা না হউক, ইংরাজী ভাষাজ্ঞতা প্রকাশের দুরন্ত প্রচেষ্টা এবং কল্পিত আধুনিক সভ্যতার সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই যে তাঁহারা এরূপ করিয়া থাকেন, ইহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। এই কদভ্যাসের ফলে, অনেকের এখন এমন অবস্থা হইয়াছে যে, কি-বাঙ্গলা কি-ইংরাজী কোনও ভাষাতেই তাঁহাদের সাধারণ জ্ঞান পর্য্যন্ত নাই এবং

এ দুইয়ের কোনটিতেই তাঁহারা আপনার মনোভাব প্রকাশ করিতে পারেন না। অবশ্য, এমন বহু বিদেশী শব্দ বাঙ্গলায় আছে, যেগুলি বাঙ্গলা ভাষায় স্থায়ী আসন অধিকার করিয়া, বাঙ্গলারই আত্মীয় গোষ্ঠীভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

বাঙ্গলা ভাষার মর্য্যাদারক্ষাহেতু তাহাদের স্থলে কষ্টগঠিত দুর্ব্বোধ্য বাঙ্গলা ভাষা ব্যবহারও অনুচিত। উদাহরণস্বরূপ—কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি, রেলওয়ে, ষ্টীমার, টিকিট, ভোট, ব্যাঙ্ক, চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি শব্দগুলি বিদেশীয় হইলেও য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের বা ডোমিসাইল্‌ড্‌ ইয়ুরোপীয়ানদের মত ইহারাও বাঙ্গলার এক একজন অত্যন্ত আপন জন হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই, ইহাদের পরিবর্ত্তে এখন অন্য কোনও শব্দের প্রয়োগও সুবোধ্য বা সুষ্ঠু হইবে না!

প্রত্যেক ভাষারই একটা চুম্বক-শক্তি আছে। ভাষা নিজের অভাব নিজেই পূরণ করিয়া লয়। প্রত্যেক ভাষাই ভাষান্তর হইতে কিছু-না-কিছু আত্মসাৎ করিয়া তবে সমৃদ্ধ হয়। বাঙ্গলা ভাষার ব্যাপারেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

ইংরাজশাসনপূর্ব্ব যুগে বাঙ্গলায় যেমন অগণিত ফার্শী, আর্‌বী, ফরাসী, ওলন্দাজ, পোর্ত্তুগীজ প্রভৃতি বিদেশী শব্দ প্রবেশ করিয়া আজ তাহারা বাঙ্গলা ভাষার স্বগোত্র হইয়া পড়িয়াছে, তেমনি আজ প্রায় দুই শতাব্দীব্যাপী ইংরাজআমলে বহু ইংরাজী শব্দকেও, বাঙ্গলা ভাষা অকুণ্ঠিত-ভাবে গ্রহণ করিয়া, মর্য্যাদাই লাভ করিয়াছে, জাতিভ্রষ্ট হয় নাই। এবং ইহাও ঠিক যে আজ পর্য্যন্ত প্রচলিত ও নিত্যব্যবহৃত বহু ইংরাজী শব্দের পরিভাষা পর্য্যন্ত সৃষ্ট হয় নাই। বৈজ্ঞানিক বিভাগগুলিতে বাঙ্গলা

ভাষায় তেমন কিছুই রচিত হয় নাই এবং যাহা হইয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহার যোগ্য সমাদর না হওয়ায় সেগুলি ব্যাপকভাবে দেশে প্রচলিতও হয় নাই। সেই জন্য বৈজ্ঞানিক ইংরাজী শব্দের ২।৪টি যে পরিভাষা সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাও জনসাধারণ গ্রহণ করিবার সুযোগ পায় নাই। সাধারণ্যে যাহা চলে, তাহাই ভাষামন্দাকিনীর কূলে গিয়া আশ্রয় পায়। যাহা চলে না, বা চলে নাই – তাহা অচলই রহিয়া যায়।

বিশ্ববিদ্যালয় এইরূপ পরীক্ষার ভাষারূপে ছাড়িয়া দেওয়ায়, অবরুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষা যে গতি আজ লাভ করিল, অনতিবিলম্বেই তাহা অপরিসীম শক্তিসঞ্চয় করিয়া, নব নব সৃষ্টিতে বাঙ্গলা ভাষায় যে অপ্রত্যাশিত ফসল ফলাইবে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। মুক্তি যখন সে একবার পাইয়াছে, তখন শক্তি তাহার জুটিবেই এবং একটুক পথ যখন সে একবার পাইয়াছে তখন স্রোতস্বতীর মত সে নিজেই তাহার রাজপথ কাটিয়া লইবে। পথে নামিলে পাথেয়ের অভাব হয় না!

বাঙ্গলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক শব্দ নাই, কারণ বিজ্ঞানের বইই রচিত হয় নাই। যে বই কেহ পড়িবে না, একখানিও বিক্রয় হইবে না—সে প্রকার গ্রন্থই বা কে রচনা করিবে? আর কেনই বা করিবে? কাজেই বাঙ্গলা সাহিত্যে কবিতা, নাটক, উপন্যাস প্রমুখ লঘু সাহিত্য রচনাতেই লেখকগণ এতদিন নিযুক্ত ছিলেন। পাঠ্য কুপাঠ্য অপাঠ্য লঘু সাহিত্যের প্রয়োজনাতিরিক্ত বাহুল্যে বাঙ্গলা সাহিত্য ভারাতুর হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া যাঁহারা অভিযোগ করেন, তাঁহারা একথাটি ভাবেন না যে গুরু-সাহিত্য রচনার সুযোগ কোথায়? অভিযোগ সহজ কিন্তু সুযোগ যে বড় দুর্লভ! ইচ্ছাও স্বাভাবিক, কিন্তু ইচ্ছায় আর সুযোগে ভাস্বর-

ভাদ্রবধূ সম্বন্ধ! অন্ততঃ আমাদের দেশে। আমি বিশ্বাস করি, বাঙ্গালী লেখকেরা ইচ্ছা করিলে, বিদেশী শব্দগুলির বাঙ্গলা পরিভাষা অনায়াসে তৈরি করিতে পারেন, কিন্তু সেই সব নবজাত শব্দগুলিকে চালাইবার সুযোগ কে দিবে?

আমাদের কতকটা সুযোগ আজ যেন আসিয়াছে, মনে হয়। এখন হইতে গল্প কবিতা নাটক উপন্যাস রচনা ছাড়া বাঙ্গলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য বিষয়ক গ্রন্থ রচনারও যে নব যুগ আরম্ভ হইবে, সেই শুভ সূচনাকে বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রত্যেক হিতৈষী আজ সাদরে ও সসম্মানে বরণ করিতেছেন।

দীপালী, ১৫ই চৈত্র, ১৩৪৬